বাংলাদেশ
ইনস্টিটিউট অব
ইসলামিক থ্যট

Since 1989

ড. তাহির আমিন

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ

উদারতাবাদ, মার্কসবাদ ও ইসলাম

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ
উদারতাবাদ, মার্কসবাদ ও ইসলাম

মূল : ড. তাহির আমিন
ভাষান্তর : ড. ম মনিরুজ্জামান

ISBN
984-70103-0006-0

প্রকাশকাল
শ্রাবণ ১৪১৫
রজব ১৪২৯
জুলাই ২০০৮

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ী ২, সড়ক ৪, সেক্টর ৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৯১১৪৭১৬, ০৬৬৬২৬৮৪৭৫৫, ০১৫৫৪৩৫৭০৬৬
Email: biit_org@yahoo.com

মূল্য
১০০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

JATIOTABAD 'O ANTORJATIKATABAD UDARPANTHA MARKSBAD 'O ISLAM (Nationalism and Internationalism in Liberalism, Marxism and Islam) written by Dr. Tahir Amin and translated into Bengali by Dr. M Moniruzzaman and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 2, Road # 4, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Bangladesh. Phone : 8950227, 9114716, 06662684755, 01554357066, Fax:02-8950227.
Email: biit_org@yahoo.com . Price : Tk. 100, $US 10.00

দ্বিতীয় অধ্যায় : মার্কসবাদ

ঐতিহ্যবাদী চিন্তাবিদগণ ৫১

- মার্কস ও এঙ্গেল ৫১

আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ ৫২

- লেনিন ৫২
- জাতীয় সমাজতান্ত্রিকতাবাদীদের অবস্থান ৫৩
- আন্তর্জাতিকতাবাদীদের অবস্থান ৫৪
- লেনিনের মতামত ৫৪
- স্টালিন ৫৭
- মাও সে তুং ৫৮

উত্তর আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ ৫৯

- ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইন ৬০
- মাইকেল হেকটার ৬১
- টম নায়ার্ন ৬২

মূল্যায়ন ৬৩

তৃতীয় অধ্যায় : ইসলাম

ঐতিহ্যবাদী চিন্তাবিদগণ ৬৫

- মুহাম্মদ ইকবাল ৬৫

আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ ৬৯

- মুহাম্মদ আইয়ূব খান ৭০
- জামাল আব্দুল নাসের ৭০

উত্তর আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ ৭১

- ইমাম খোমেনী ৭২
- সায়্যেদ মওদূদী ৭৩
- সায়্যেদ কুতুব ৭৪

মূল্যায়ন ৭৫

চতুর্থ অধ্যায় : পরিশিষ্ট ৭৭

পাদটীকা ৮১

গ্রন্থপঞ্জী ৮৮

প্রকাশকের কথা

একদিকে পশ্চিমা বিশ্ব জাতিরাষ্ট্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে Supra National Community গঠনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং অপরদিকে মুসলিম বিশ্ব জাতিরাষ্ট্রের প্রতি সংহতিবোধ বনাম বৃহত্তর উম্মাহ্‌র প্রতি সংহতিবোধ– এ দুই ধরনের প্রবণতার মাঝে দোদুল্যমান।

সর্বোপরি স্নায়ুযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিদ্যমান আদর্শিক বনাম জাতিগত ও জাতীয় আনুগত্যের মধ্যকার বিরোধের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব মানচিত্র বড় ধরনের পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

এমতাবস্থায় লেখক তাহির আমিন তার গবেষনা কর্মে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিশ্বের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শ 'উদারতাবাদ', 'মার্ক্সবাদ' এবং 'ইসলাম'-এর দৃষ্টিভঙ্গির যে সাবলিল উপস্থাপন করেছেন তা নি:সন্দেহে সময়োচিত।

একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা গড়ার অত্যাবশ্যক পদক্ষেপ হিসেবে একটি বাস্তব সম্মত আন্তর্জাতিক ঐক্যমত্য (International Understanding) এবং সংলাপের (Dialogue) প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরা হয়েছে এ বইয়ে।

এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের অনুবাদ শেষে এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে পেরে বিআইআইটি সত্যিই আনন্দিত।

বইটি রাজনীতিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক সহ চিন্তাশীল পাঠকের জন্যে বিশেষ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের গবেষক, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে একটি রেফারেন্স হিসেবে কাজে লাগবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এম আবদুল আযিয
উপ-নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

অনুবাদকের কথা

ড. তাহির আমিনের লিখিত জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ একটা সুলিখিত তুলনামূলক গ্রন্থ। আমাদের বাংলাভাষায় এমন ধরনের তুলনামূলক প্রকাশনা খুব একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ গ্রন্থটা আরো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এখানে পাশ্চাত্যের আধুনিক চিন্তাদর্শনের সঙ্গে ইসলামী মতবাদের তুলনা করা হয়েছে। আমাদের বাংলাভাষায় লিখিত পাশ্চাত্য মতবাদ, মতাদর্শ বা দর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি হয়তোবা পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামের সঙ্গে তুলনা করলেও সেক্ষেত্রে দু'ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ বিষয়টাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষায়িত জ্ঞানের আলোকে লেখা হয় না। দ্বিতীয়তঃ লেখকেরা একই সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন ও ইসলামের উপর সমানভাবে বিজ্ঞ নন। ড. তাহির আমিনের বর্তমান গ্রন্থ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এ গ্রন্থে উভয় ভাবধারার মতবাদ বা মতাদর্শকে সমান প্রজ্ঞার সঙ্গে তুলনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাই এরূপ গ্রন্থ বাংলাভাষায় একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

বর্তমান গ্রন্থটা লিখিত হয়েছে বিগত শতাব্দীর শেষপ্রান্তে যখনও পৃথিবীর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাটা ছিল দ্বি-মেরুভিত্তিক (Bipolar), যেখানে আমেরিকা ছিল পশ্চিমা পুঁজিবাদের নেতা এবং সোভিয়েত রাশিয়া ছিল সমাজতান্ত্রিক মতবাদের নেতা। এ উভয় মতবাদই জাতীয়তাবাদের মুখোশের আড়ালে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী ছিল। উভয় মতবাদই বিশ্বব্যাপী প্রভাব ও একচ্ছত্র বিস্তারে একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ ও বিরোধিতায় নিমগ্ন ছিল। যেহেতু এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গ্রন্থটা রচিত, তাই এটার আলোচনা ও পর্যালোচনা তৎকালীন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু এ গ্রন্থ প্রকাশের অব্যবহিত পরেই পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন ঘটে যায়। ১৯৯১

সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও মতাদর্শের পতন হয়, দুই পরাশক্তির একটা হিসেবে রাশিয়ার পতন হয়; এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদ ও উদারবাদ পৃথিবীতে একমাত্র বিজয়ী মতাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ ব্যাপারটাকে 'ইতিহাসের সমাপ্তি' বলেও উল্লেখ করা হয় (Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, 1992)।

এরপর বিগত পনের বছরে বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে তাতে এমন গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীতা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। সমাজতন্ত্রের মৃত্যুর পর পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী উদারবাদ নতুন এক প্রতিযোগীর সন্ধান পায়- সেটা হলো ইসলাম। এ পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয় নতুন নতুন তত্ত্ব নয়া বিশ্বব্যবস্থা। এর মধ্যে একটা তত্ত্ব ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়, সেটা হলো সামুয়েল হানটিংটনের 'সভ্যতার সংঘর্ষ' তত্ত্ব (Clash of Civilizations and the Remaking of the New World Order, 1993)। এ তত্ত্ব মূলতঃ আমেরিকার বিকাশমান নব্যসাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি অথবা তাত্ত্বিক প্রতিফলন। কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পরিশেষে পাশ্চাত্য ও ইসলামী সভ্যতাকে মুখোমুখী ও সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে দেয়। সে ঘটনাগুলো যেমন-ইরান-ইরাক যুদ্ধের অবসানে ইরাক আক্রমণের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রবেশ; ফিলিস্তিনী সমস্যাকে অন্যান্য মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফিলিস্তিনীদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে রূপান্তরের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্যকে বিভক্তকরণ ও মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলী আধিপত্য নিশ্চিতকরণ; মধ্যপ্রাচ্য, বলকান ও মধ্য এশিয়া জুড়ে মুসলিম নিধনযজ্ঞ; ২০০০ সালের ৯-১১ দুর্ঘটনার কারণে আফগানিস্তানে আমেরিকার আগ্রাসন এবং বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের নামে মুসলিম বিরোধিতা, বিশেষতঃ ইসলামী আন্দোলন ও সর্বপ্রকার ইসলামী পুনঃজাগরণমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা; এবং সবশেষে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের মিথ্যা অজুহাতে আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্বের ইরাক আগ্রাসন। এ সকল কার্যকলাপের মাধ্যমে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটা হলো বিশ্বব্যাপী পাশ্চাত্য-বিশ্ব ইসলামের বিরুদ্ধে সভ্যতার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। মুসলিম-বিশ্ব বর্তমানে দু'টো মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন। এক, ইসলামকে রাজনীতি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করা; এবং দুই, পাশ্চাত্য উদারবাদকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে নতুন উদারপন্থী পরিচয় বরণ করা। যারা এ দু'টো করতে অস্বীকার করছে তাদেরকে ইসলামী সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে বিশ্বব্যাপী তাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। সত্যিকারভাবেই পৃথিবীতে আজ দু'টো পরস্পরবিরোধী মতাদর্শের উদয় হয়েছে। তাহলো, উদারপন্থা ও ইসলাম। ইসলাম তাই আজ সত্যিকার অর্থেই সংকট ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এমতাবস্থায়, একটা মতবাদ হিসেবে ইসলামের আত্ম-প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব আরো লক্ষগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ বিষয়ে

ইতোপূর্বে ইসলামের যা বলার ছিল আজ তা আরো শক্তভাবে বলার ও বিকল্প মতবাদ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার সময় এসেছে। মুসলিম বিশ্বের সামনে এখন বিরাট প্রশ্ন : তারা কি ধর্মহীন-জাতীয়তাবাদের উপর নির্ভর করে আরোপিত আত্মপরিচয় নিয়ে একে অপরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে এবং পাশ্চাত্যের অনুকম্পা ও দাস হয়ে থাকবে? নাকি ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদ (উম্মাহ) এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম বিশ্বের পুন:ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বতা প্রমাণ করবে? এ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম।

অনুবাদকর্ম স্বভাবতই খুবই কঠিন কাজ। মূলভাষার ভাব ও গাম্ভীর্য বজায় রেখে একই অর্থ অন্য ভাষায় রূপান্তর করা দূরূহ। বর্তমান অনুবাদে যতটুকু সম্ভব মূল ইংরেজী ভাষার ভাব ও গাম্ভীর্য বজায় রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষার চেয়ে ভাবকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যাতে আলোচনার প্রাঞ্জলতা বজায় থাকে। তারপরও যদি ব্যঞ্জনার ব্যত্যয় ঘটে তবে তা একান্তই অনুবাদকের সীমাবদ্ধতা বলে ধরে নিতে হবে। সর্বপ্রকার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা গ্রন্থ বাংলা ভাষায় পাঠকদের সামনে উপহার দেয়াটাও কম আত্ম-তৃপ্তির ব্যাপার নয়। পাঠকদের সামান্য উপকারও এমন তৃপ্তিকে আরো মধুরতর করে তুলবে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট-এর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা এমন একটা গ্রন্থের অনুবাদ করার সম্মান প্রদান করার জন্য। বিশেষত: জনাব এম. আবদুল আযিয সাহেবের প্রতি ব্যক্তিগত ঋণ যার পীড়াপীড়ির ফলশ্রুতি এ অনুবাদগ্রন্থ।

ম. মনিরুজ্জামান
কুয়ালালামপুর
জুলাই ৩, ২০০৬

পূর্বকথা

আজকের যুগের মানুষ ঠিক সুদূর অতীতের তার পূর্বপুরুষদের মত একই সমস্যার সম্মুখীন। সমস্যাটা হলো- বহুবিধ পরিচিতির মধ্যে আইনগত সমন্বয় সাধন করা, বহুবিধ আনুগত্যের মধ্যে সুসামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা। কারণ, বরাবরের মত আজকের যুগের মানুষ ছোট বড় বিভিন্ন প্রকার সামষ্টিক পরিচয় বহন করে। একই সময়ে সে তার পরিবারের একটা অংশ, প্রতিবেশীর একটা অংশ, তার পেশাশ্রেণীর একটা অংশ, একটা নির্দিষ্ট ভূ-সীমার অংশ এবং একটা নৃ-জাতিক বা ভাষাভিত্তিক শ্রেণীর অংশ যেগুলোর সঙ্গে সে তার পরিচয়কে আবদ্ধ করে। সর্বোপরি সকল প্রকার পরিচিতি ছাড়াও সে বৃহত্তর মানবজাতির একটা অংশ হিসেবেও সচেতন।

সুতরাং পূর্বকালের মত আজও মানুষের আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দুতার বিভিন্নতা রয়েছে। সৌভাগ্যবশতঃ এটার কারণেই মানুষের আনুগত্যের পরস্পরবিরোধী পরিচিতি বা দাবির প্রতিযোগিতা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। আর ঐ সমস্ত আনুগত্যের ভিতরে এমনভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয় যাতে ব্যক্তি তথা যে সকল গ্রুপের সঙ্গে সে পরিচয়ে আবদ্ধ তাদের উভয়ের কল্যাণ বয়ে আনে।

॥ ১ ॥

আধুনিকতাপূর্ব সময়ে মানুষ সাধারণতঃ ইসলাম বা খৃষ্টবাদের মত ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণের প্রতি ভক্তি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গঠিত জনসমষ্টির অংশ হিসেবে ভাবতে স্বাচ্ছন্দবোধ করত। একজনের আনুগত্য প্রাথমিকভাবে তার জাতি কিংবা পিতৃভূমির প্রতি হবে এমন ধারণা বলতে গেলে ছিলই না। এ ধারণাটা যেটা জাতীয়তাবাদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে সেটার উদ্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে সংঘটিত হয়। এবং তখন থেকে মানব ইতিহাসের একটা মারাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ ইউরোপের মানচিত্র পুনর্গঠনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল। বস্তুতঃপক্ষে এর প্রভাব পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ব্যাপকতর হয়ে দেখা দিয়েছিল যেটা বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিশাল রাজনৈতিক পরিবর্তন আনয়ন করেছিল। জাতীয়তাবাদের নামে বহু বিভক্ত মানবজাতিকে একীভূত করা হয়েছিল। ঠিক যেমন এর প্রভাবে সবচেয়ে রক্তপাতময় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং এমনভাবে মানবসমাজকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল যার নজীর ইতোপূর্বে ছিল না। তথাপি আধুনিক ইতিহাসে কখনো স্বজাতি এবং অন্যান্য গ্রুপের প্রতি আনুগত্যের দ্বন্দ্ব, তা সেটা যত ছোট কিংবা বড় হোক না কেন, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। যাই হোক, স্বজাতির প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি সাধারণতঃ প্রভাবশীল আবেগ হিসেবে কাজ করে এসেছে এবং ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে এটার গুরুত্বকে সেভাবেই মূল্যায়ন করা হয়েছে।

তবে পর্যায়ক্রমে মানুষের সমগ্র মানবজাতির অংশ হওয়ার ধারণা, যেটা সর্বকালে জাগ্রত ছিল ও অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে এবং বিশেষতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন এ অনুভূতিকে বর্ণবাদের ধ্বংসাত্মতা সত্ত্বেও একটা সামগ্রিক মানবতার পক্ষে আরো জোরদার করে তুলেছে। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগেও কল্পনা করা হচ্ছিল যে, সময়ের বিবর্তনে জাতীয়তাবাদের প্রতিপত্তির অবক্ষয় হবে, বিশ্বের বিভিন্ন জাতি এক প্রকার নিবিড় বন্ধনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দিকে ধাবিত হবে, এবং মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী বাধা-বিপত্তিগুলো অপসারিত হবে। কিন্তু বিগত দু'তিন দশকে (আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে) যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে গবেষকদের স্তম্ভিত করেছে। পশ্চিমা উদারবাদের প্রভাবে প্রভাবিত অনেক দেশ নিঃসন্দেহে বিশ্বের অনেক স্থানে গতানুগতিক জাতীয়তাবাদের অবক্ষয়ের প্রত্যাশা করেছিল। অপরদিকে তারা জাতীয়তাবাদের আবেগে প্রভাবিত এবং নৃ-জাতিক আন্দোলনের উত্থানকেও প্রত্যক্ষ করেছে। মজার ব্যাপার হলো যে, পাশাপাশি তারা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী যেমন-ইউরোপীয় কম্যুনিটির উত্থান এবং একটা আন্তর্জাতিক সমাজভিত্তিক ধারণার উপর উত্তরোত্তর গুরুত্বারোপকে প্রত্যক্ষ করেছে।

একইভাবে, মার্কসবাদ দ্বারা প্রভাবিত দেশগুলোও বেশ কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। মার্কসবাদের অধীনে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকরা একতাবদ্ধ হবে, কারণ কম্যুনিষ্ট মেনিফেস্টোর ভাষায়, শৃঙ্খলমুক্ত হওয়া ছাড়া তাদের হারানোর আর কিছু নেই। বিশ্বজনীন মার্কসবাদী এলডোরাডোর স্বপ্ন শুধু আকাশ কুসুমই প্রমাণিত হয়নি, বরং মার্কসবাদের অধীনে নিস্পেষিত মানবতা খোদ মার্কসবাদকেই শৃঙ্খল হিসেবে গণ্য করেছে এবং জাতীয়তাবাদের আবেগে প্রভাবিত হয়ে তারা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

ইসলামী বিশ্বের সাম্প্রতিক দশকগুলোর পরিবর্তন কম আশ্চর্যজনক নয়। আধুনিক যুগে বিশ্বব্যাপী ধর্মনিরপেক্ষতার আধিপত্যতা বজায় থাকার কারণে গ্রুপ পরিচিতি এবং জাতিসত্ত্বার ভিত্তি হিসেবে ধর্মের পুনরুত্থানকে অসম্ভব বলে বিশ্বাস করা হতো। অনেককে হতবাক করে দিয়ে ১৯৪৭ সালে বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম মুসলিম দেশের জন্ম হলো যার একমাত্র ভিত্তি ছিল এ যে, যারা ইসলামের বিশ্বাস দ্বারা একতাবদ্ধ দক্ষিণ এশিয় উপমহাদেশে তাদের আলাদা জাতি হওয়ার অধিকার রয়েছে। অতি সাম্প্রতিককালেও বেশ কয়েকটা ক্ষেত্রে ইসলামীবিশ্ব আন্তর্জাতিক ইসলামী পরিচিতির পক্ষে সুদৃঢ় মনোভাব প্রত্যক্ষ করেছে। কোন কোন সময় মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে এমন আত্মপরিচিতি এতই শক্তিশালী আকার ধারণ করেছে যে কিছু রাজনৈতিক সুবিধাবাদী যারা ইসলাম বিদ্বেষী হিসেবে পরিচিত তারা ইসলামী আবেগকে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। এটা বেশ দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ইসলামী আত্ম-পরিচিতির এ নবজন্ম এবং বিশ্বজনীন মুসলিম উম্মাহর উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ মুসলিম বিশ্বের কোন কোন অংশে বিপরীতমুখী ঘটনার দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। যেমন- সংকীর্ণ ভাষা ও নৃ-জাতিভিত্তিক

জাতীয়তাবাদের উত্থান যেটাকে ইসলামী পরিভাষায় 'আসাবিয়্যাহ' নামে অভিহিত করা হয়। যার ফল হলো একটা ভাষা বা নৃ-জাতিক মুসলিম সমাজ অন্য ভাষা বা নৃ-জাতিক মুসলিম সমাজকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে লাগলো।

॥ ২ ॥

বর্তমান গ্রন্থে ড. তাহির আমিন মূল্যায়ণ করেছেন বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে উদারবাদ, মার্কসবাদ ও ইসলামী চিন্তাধারার বিখ্যাত চিন্তাবিদগণ কিভাবে মানুষের একাধিক পরিচয়ের সমস্যাটাকে নিয়ে বিদগ্ধ আলোচনা করেছেন। গ্রন্থাকার যে তথ্য এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মূল্যায়ণ পেশ করেছেন তা নি:সন্দেহে উক্ত তিনটা চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন এবং এদের অনুসারী তথা সমগ্র বিশ্বের উপর উক্ত চিন্তাধারাত্রয়ের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর কি প্রভাব পড়বে তা মূল্যায়ণ করা যথেষ্ট। এটা সুস্পষ্ট যে, এর উপকারিতা শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে না। আশা করা যায় যে, অর্জিত অন্তর্দৃষ্টি ঐসব বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর অনুসারীদেরকে আরো অর্থবহ সংলাপে নিয়োজিত হতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে আরো ফলপ্রসূ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

এটা সত্য যে, মনে হচ্ছে বর্তমানে মার্কসবাদ এমনভাবে পশ্চাৎপদতায় নিমগ্ন যে তাতে মনে হচ্ছে এটা বাস্তবতা বিবর্জিত হয়ে উত্তরোত্তর একটা ঐতিহাসিক বিষয়ে পরিণত হতে চলেছে। তবে মার্কসবাদের বর্তমান অধ:গতিতে এ সত্যটা ভুলে থাকা সমীচীন হবে না যে, বর্তমান (বিগত) শতাব্দীর একটা বৃহদাংশ জুড়ে এটা লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর অবকাঠামো গঠন করেছে এবং বিশ্বের একটা বিশাল অংশ জুড়ে অনেকগুলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান উপহার দিয়েছে। এটা ঠিক যে, মার্কসবাদের প্রতি বর্তমান অনাগ্রহতা এতই গভীর ও ব্যাপক যে অদূর ভবিষ্যতে এর পুনঃজনপ্রিয়তা সম্ভাবনার অতীত। তথাপি ইতিহাস যদি কোন কিছু শিক্ষা দিয়ে থাকে তাহলে মহৎ চিন্তার কদাচিৎ মৃত্য ঘটে; এগুলোর উদ্ভব হয়, বিলুপ্তি ঘটে এবং পরবর্তীতে চক্রাকারে পুনর্ভাব হয়।

বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে মার্কসবাদের দ্রুত অপসৃয়মান পরিস্থিতিতে ইসলামী এবং পশ্চিমা উদার চিন্তাধারার মধ্যে লেনদেন, তা সেটা বন্ধুত্বসুলভ বা অন্য যেটাই হোক না কেন, তা বৃদ্ধি করবে এবং আরো গুরুত্ব বহন করবে। প্রকৃতপক্ষে এটা সবার নিকট সুস্পষ্ট যে, শুধুমাত্র পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোই নয়, বরং পাশ্চাত্য বিজ্ঞ সমাজও ইসলাম সম্পর্কে এক ধরনের সতর্কতামূলক প্রচারণা শুরু করেছে যেটা ইতোপূর্বের কম্যুনিষ্ট বিশ্বের মত ভয়াবহ বলে অনুভূত হচ্ছে। মুসলিমদের সম্পর্কে বর্তমান পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী কম্যুনিষ্ট মেনিফেস্টোর প্রথম বাক্যটাই স্মরণ করিয়ে দেয় যেটাতে মার্কস ও এঙ্গেলস দ্যর্থহীনভাবে বলেছেন, "ইউরোপকে একটা ভূত তাড়া করে ফিরছে, সেটা হলো কম্যুনিজম ভূত।" একটু পরিবর্তন করে এটাকে এভাবে পুনঃব্যক্ত করা যায় যে, "পাশ্চাত্যকে একটা ভূত তাড়া করে ফিরছে, সেটা হলো ইসলামী ভূত।" ইসলাম বা "উগ্র-ইসলাম" (Militant Islam) সম্পর্কে ভীতি পাশ্চাত্য সমাজে এতটাই

মারাত্মক আকার ধারণ করেছে এবং "ইসলামী মৌলবাদ" এর বিরুদ্ধে বিষোদগার ও ঘৃণা এতটাই জঘন্য রূপ নিয়েছে তাতে মনে হয় যেটার একমাত্র প্রয়োজন সেটা হলো ইসলামী বিশ্ব ও পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে সুসম্পর্কের সেতু রচনা করা।

এটা পরিষ্কার যে, পাশ্চাত্যের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের ভিতর ইসলাম এবং মুসলিম সম্পর্কে অহেতুক ভয়, ঘৃণার কথা না হয় বাদ দেয়া হলো, এটা অনস্বীকার্য বাস্তবতা। দুভার্গ্যবশতঃ অনেক সংখ্যক পশ্চিমা চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের পাণ্ডিত্য, দুঃসাহস ও দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপকতা ও উদারবাদের প্রচলন থাকা সত্ত্বেও এ অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। এটাও অস্বীকার করা যাবে না যে, বিভিন্ন কারণে মুসলিমরাও তাদের প্রতি পাশ্চাত্যের নেতিবাচক মনোভাবের সমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী খৃস্টজগত ও ইসলামী বিশ্বের মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্কের আলোকে ব্যাখ্যা করা গেলেও ইতোপূর্বে ইতিহাসে আর কখনো এমন প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি যে বিভিন্ন বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন জনগোষ্ঠী একে অপরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে একে অপরের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর গভীরতর মূল্যবোধকে অনুধাবণ করতে সচেষ্ট হবে এবং সমগ্র বিশ্ব পর্যায়ে মানবতার সম্পর্ককে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে সে বিষয়ে অবগত হবে।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতীয়তাবাদে অনুরাগ আছে এমন যে কারোর মত আমার মনে হয় যে, আমি উদারবাদ, মার্কসবাদ ও ইসলামের আলোকে উপস্থাপিত চিন্তাবিদদের জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ সমস্যার বর্তমান গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনাকে সজাগ দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করে আমার এ বিষয়ে জ্ঞান ঋদ্ধ হয়েছে। একই সঙ্গে যেহেতু আমি আমার বুদ্ধিবৃত্তিক পেশার প্রথমদিকে আরববিশ্ব ও দক্ষিণ এশিয় উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও ইসলামী চিন্তাধারার মুখোমুখী সম্পর্ক নিয়ে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম তাই এটা মনে হয় আমার জন্য খুব অসমীচীন হবে না যদি আমি কয়েকটা বিষয়ের উপর আলোকপাত করি এবং ইসলামী বিশ্বের সমস্যার ধরন সম্পর্কে কিছু মতামত পেশ করি, যদিও তা বিজ্ঞ গ্রন্থকারের বিদগ্ধ আলোচনার তুলনায় পাদটীকাস্বরূপ।

॥ ৩ ॥

শুরুতেই এটা পরিষ্কার থাকা ভালো যে, ইসলামের ইতিহাসে এটা প্রথমবারের মত নয় যে ইসলামকে বিভিন্নমুখী আনুগত্যতার সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। এর একেবারে প্রথম যুগে ইসলামকে মুখোমুখি হতে হয়েছে প্রাক-ইসলামী যুগের সমাজ ব্যবস্থার চলমান প্রেতাত্মা "*আসাবিয়্যাহ*" (গোত্রবাদ) এর। *আসাবিয়্যাহ* হলো, যা পরে আলোচিত হবে, এমন একটা আদর্শ যেটা জাতীয়তাবাদের সঙ্গে অনেকাংশে মিল রাখে যেহেতু এটা গোত্র বা দলের প্রতি নিঃশর্ত ও বন্ধনহীন আনুগত্য দাবি করে। এতদোভয়ের মধ্যকার আশ্চর্যজনক মিল হলো যে, *আসাবিয়্যাহ* হলো গোত্রের প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য, আর জাতীয়তাবাদ হলো জাতির প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য। আরো

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর আরবদের মূলমন্ত্র ছিল "নিজের ভাই (গোত্রসদস্য) এর পক্ষ নাও, তা সে ন্যায় করুক বা অন্যায় করুক।" বর্তমান শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী মূলমন্ত্রের কাছাকাছি আর কেউ আসতে পারবে কি যেটা হলো "আমার জাতি : ন্যায় করুক বা অন্যায়!"

ইসলাম তীব্রভাবে *আসাবিয়্যাহ*'র ধারণাকে নিন্দা করে। রাসূল (সঃ) এর বাণী অনুযায়ী যে *আসাবিয়্যাহর* জন্য যুদ্ধ করে বা এর প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে সে "আমার দলের অন্তর্ভুক্ত না" (মুসলিম, ইমারাহ, ৫৭)। গোত্রের পরিবর্তে ইসলাম নিজেই একটা প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, একটা প্রধান একত্রীকরণ শক্তি, সামষ্টিক সুসংঘবদ্ধতার প্রাথমিক ভিত্তি। সেজন্য কুরআন অনুযায়ী মুসলিমরা একে অপরের ভাই ভাই অন্য কিছু নয় (৪৯:১০) এবং রাসূল (সঃ) বলেছেন মুসলিমরা অন্যের মোকাবিলায় "একহস্ত" (আবু দাউদ, জিহাদ, ১৪৭)। এটা কি আরেক আধিপত্যবাদ-ইসলামী আধিপত্যবাদ জন্ম দেয়ার নামান্তর? এটা কি মুসলিম আত্ম গৌরব বর্ধনের বৈধ কারণ হিসেবে দেয়া হয়েছিল?

একত্ববাদের উপর ভিত্তি করে একটা বিশ্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা মূলতঃ মুসলিম উম্মাহর মৌলিক মিশন। সাধারণার্থে একটা গোত্র বা জাতির মত মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্য কোন দলীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য বা এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উচ্চাশা পূর্ণ করার জন্য নয়। এটা হলো একটা উম্মাহ যেটার অস্তিত্ব নিজের জন্য না হয়ে "সমগ্র মানবজাতির জন্য" (৩:১১০)। অধিকন্তু এটা হলো একটা উম্মাহ যার মিশন হলো খোদার বাণীকে সমুন্নত রাখা, সত্য এবং সুবিচারের সাক্ষী হওয়া, অনবরত কল্যাণের সম্প্রচার ও অনিষ্টের বিরোধিতা করা। এর মানে এটা নয় যে, মুসলিম ব্যতিত অন্যান্য সামষ্টিক সমাজ কখনো কল্যাণকে সমর্থন ও মন্দের বিরোধিতা করবে না। মুসলিমদের ক্ষেত্রে সত্যকে সমর্থন করা, ন্যায়কে ধারণ করা এবং মন্দকে বিরোধিতা করা তাদের অবধারিত মিশন। এ মিশনকে পূর্ণ করতে মুসলিমদের ভিতরে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা জরুরী যেহেতু পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমর্থন তাদের মিশনকে বাস্তবায়নে বিশাল শক্তি সঞ্চয় করে। মুসলিম সমাজের এ অন্তর্নিহিত সুদৃঢ়করণ প্রাথমিকভাবে সমগ্র মানবতাকে সেবা করার আকাংখা এবং খোদা ভীতি ও কল্যাণ, ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠা এবং দয়া ও মহানুভবতা মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। সেজন্য মুসলমানরা ইসলাম কর্তৃক নির্দেশিত সুউচ্চ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তাদের ঐক্যকে ইতিহাসে ভূমিকা পালনে অতি প্রয়োজনীয় মাধ্যম হিসেবে সর্বদা গণ্য করে এসেছে।

অবশ্য মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গীর এ আদর্শবাদিতা তাদেরকে মুসলিম উম্মাহ ব্যতিত অপরাপর বন্ধন যেগুলো তাদের বিভিন্ন অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত করে সেগুলোর প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব প্রদানে বিরত রাখেনি। এটা এমন নয় যে ইসলাম ঐ সকল অস্তিত্বকে শুধু প্রাকৃতিক এবং জীবনের বাস্তবতা বলে স্বীকার করে আর তাই সেগুলোকে সামাজিকভাবে স্বীকার করে নিতে হবে। বরং মনে করে এগুলো খোদার অসীম বুদ্ধিমত্তার বহিঃপ্রকাশ। কুরআনের আয়াত অনুযায়ী "আর তাঁর নিদর্শনের নমুনা হলো

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা" (৩০:২২)। ঠিক এমনিভাবে একদিকে যেমন কুরআন সমগ্র মানবজাতিকে বস্তুতঃপক্ষে এক বলে ঘোষণা দিয়েছে, তেমনি মানবজাতিকে গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করাকেও খোদা প্রদত্ত বলে গ্রহণ করেছে। ঠিক একদিকে যেমন কোন জাতি, গোত্র বা বর্ণের সঙ্গে সম্পৃক্ততাকে একে অপরের উপর উৎকৃষ্টতার নির্দেশক হিসেবে গণ্য করাকে অসঙ্গত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, তেমনি মানবজাতিকে বিভিন্ন পরিচয়ে বিভক্ত করার মাধ্যমে একে অপরকে ভালভাবে বোঝার পথ সুগম করা হয়েছে (কুরআন ৪৯:১৩)।

কুরআন এবং হাদিসে বর্ণিত ইসলামী নির্দেশনামা এবং ইসলামের প্রথম যুগে এর বাস্তবায়ন মানুষের একাধিক সামষ্টিক পরিচয়ের দ্বন্দ্বকে ভারসাম্যপূর্ণ ও মডারেট দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখার কথাই নির্দেশ করে। এটা এ বাস্তবতা থেকে প্রমাণিত যে, ইসলামী পরিচিতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ ইসলামের দাবি কখনো অন্যান্য প্রাকৃতিক গ্রুপ যেমন পরিবার, প্রতিবেশী, দল বা গোত্রের মর্যাদাকে অস্বীকার করেনি। তাই এটার কোন কারণ নেই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঐ সব ক্ষুদ্র পরিচয়ের ব্যাপারে যেটা প্রয়োগ করা হতো সেটা কেন আজকের যুগের বৃহত্তর পরিচয় যেমন একই পিতৃভূমির একই ভাষা বা একই সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

গোত্রের প্রতি ইসলাম যে মনোভাব প্রদর্শন করেছে সেটা বিশেষভাবে শিক্ষণীয়। এটা সত্য যে, ইসলাম মুসলিম উম্মাহ নামে একটা আলাদা পরিচিতির জন্ম দিয়েছে যেটা গোত্র প্রথার উর্ধ্বে। আর এটাও সত্য যে, এ উম্মাহ মুসলিমদের নিকট থেকে খুব উচ্চ পর্যায়ের আনুগত্য দাবি করে। কিন্তু গোত্র বা রক্ত সম্পর্কিত গোত্র প্রথার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কেমন ছিল? আমাদের মতে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীকে এভাবে প্রকাশ করা যায় যে, ইসলাম গোত্র বা রক্ত সম্পর্কিত গোত্র প্রথাকে নির্মূল করতে চায়নি এবং মুসলিমদেরকে এর প্রতি সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পণ করতেও বলেনি । ইসলাম মুসলিম মানসে এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দিতে চেয়েছে যার মাধ্যমে তারা গোত্রকে ধ্বংস না করে বরং এর উর্ধ্বে অবস্থান করবে। তবে ইসলাম যেটা ধ্বংস করতে চেয়েছে সেটা হলো *আসাবিয়্যাহ* যেটার অর্থ মোটামুটিভাবে গোত্র-শ্রেষ্ঠত্ববাদ বলে করা যায়। কারণ ইসলাম যেটার তীব্র বিরোধিতা করেছে সেটা হলো ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরব ভূমিতে প্রচলিত গোত্রের প্রতি অতিমাত্রার আনুগত্যতা। এটার কারণ ছিল এ যে, গোত্রের প্রতি আনুগত্যকে অন্য সবকিছুর উপরে এমনভাবে গুরুত্ব দেয়া হতো যে গোত্রের স্বার্থে সত্য ও মিথ্যা এবং ঠিক ও বেঠিককে জলাঞ্জলি দেয়া হতো। আবার ধর্মীয় বন্ধন যেটা মুসলিমদেরকে একটা উম্মাহতে আবদ্ধ করে তার থেকে ভিন্ন এমন কোন মনোভাবকে সমীচীন মনে করে না যেটা গোত্র-সম্পর্ককে ধর্মীয় বন্ধন থেকে দৃঢ় বলে বিশ্বাস করে। সুতরাং ইসলামের মতামতের মূলকথা হলো, এটা ইসলামী পরিচিতি ব্যতিত অন্য সকল পরিচিতির বৈধতাকে অস্বীকার করে না। বরং ইসলামের মতামত হলো এমন একটা পরিচিতিকে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করা যেটা শুধুমাত্র একক খোদায়ী বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল। যেটা কুরআনকে খোদার কালাম হিসেবে গ্রহণ করে। মুহাম্মদ (সঃ) কে

খোদার শেষ এবং চূড়ান্ত বার্তাবাহক হিসাবে স্বীকার করে এবং বিশ্বাস করে যে, সমগ্র মানবতার জন্য ইসলামই হলো একমাত্র সত্য জীবন-বিধান।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মুসলিমরা ইতিহাসের আসনে আবির্ভূত হয়েছে তখন তারা ছিল একটা একক রাজনৈতিক অস্তিত্ব। এ অবস্থাটা ইসলামের প্রথম শতাব্দী নাগাদ বর্তমান ছিল। কিন্তু পর্যায়ক্রমে মুসলিমবিশ্ব একাধিক রাজনৈতিক পরিচিতিতে বিভক্ত হয়ে পড়লো। তথাপি, যখন মুসলিমদের রাজনৈতিক জীবনে বহুবিধ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব একেবারে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছিল তখনও মুসলিম মনীষী ও চিন্তাবিদগণ দারুল ইসলামের একীভূতকরণের চিন্তাভাবনাকে পরিত্যাগ করেননি। ইসলাম ঐক্যের একটা সুদৃঢ় অবকাঠামো প্রদান করেছিল যেটার ভিত্তি ছিল একই বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী, একই নৈতিক মূলনীতি, আইন ব্যবস্থার ঐক্যতা এবং তদরূপ আরো অসংখ্য বিষয়ের ঐক্যতা যেগুলো একটা মাত্র মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নিঃসৃত। অবশ্য মুসলিম মনীষী ও চিন্তাবিদগণ সাংস্কৃতিক ঐক্যতার ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন না যেটা মানুষের জীবনধারার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হতো। তাঁরা সাধারণতঃ মূল আদর্শ তা সে যতই অবাস্তব বা অতিমাত্রিক হোক না কেন ইসলামী রাষ্ট্রের আদলে তেমন একটা একীভূত রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেটা সমগ্র ভূ-খণ্ডকে অন্তর্ভূক্ত করবে (এটা মনে হয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ যে আগের যুগের বিজ্ঞ মুসলিম চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারে পুরোপুরি একমত ছিল কি না তা অনুসন্ধান করা। অধিকন্তু, তাঁদের নিজস্ব মতামতের স্বপক্ষে কুরআন বা হাদিস থেকে কি ধরনের যুক্তি-দলিল গ্রহণ করেছিলেন সেটা উদঘাটন করাও জরুরী)।

॥ ৪ ॥

আমূল পরিবর্তিত বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে মুসলিমরা আবারো এমন সব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে যেগুলোর মুখোমুখি তারা ইতিহাসে এর আগেও হয়েছে। জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তার উর্ধ্বে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য - এ দুটোর সংকট মোকাবিলা করতে গিয়ে কিছু কিছু মুসলিম চিন্তাবিদগণ পুরোপুরিভাবে পদস্খলিত হয়েছেন এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী নব্য মতাদর্শের নিকট নতি স্বীকার করেছেন। এটার জ্বলন্ত উদাহরণ হলো বেশকিছু মুসলিম দেশে রাষ্ট্র সীমানা ও ভাষা স্বাতন্ত্রতাকে অতি মাত্রায় মহত্বতা প্রদান করা। এখানে আমরা কিছু বাস্তব উদাহরণ উল্লেখ করতে পারি। যেমন মিশরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভুত দেশপ্রেমের নির্ভেজাল আবেগ পর্যায়ক্রমে মিশরীয় জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে রূপ লাভ করে। এর প্রভাবে অনেক মিশরী জাতীয়তাবাদীরা মিশরীয় মুসলিম ও দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে অবস্থিত সমধর্মের মানুষদের সঙ্গে সকল প্রকার যোগসূত্রকে অস্বীকার করলো, তারা এ ব্যাপারে একেবারে দৃষ্টান্ত হয়ে গেল যে, নব্বই শতাংশ মিশরী জনগণ ছিল শক্ত ইসলামী বিশ্বাসে বিশ্বাসী মুসলিম। তাই শুধু নয়, বরং তারা ফেরাউন ও তাদের ঐতিহ্যকে মহৎ এবং তাদেরকে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে গণ্য করতে শুরু করলো। তেমনিভাবে একপর্যায়ে ইরানী ও তুর্কী জাতীয়তাবাদ ইসলামের প্রতি যৎসামান্যই শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করতো; প্রকৃতপক্ষে তারা সামষ্টিক জীবনে ইসলামকে

অবজ্ঞাই করেছিল এবং তাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে তারা অবমূল্যায়ণ করেছিল। ইসলাম ও আরব সংস্কৃতির মধ্যে খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকার পরও আরব জাতীয়তাবাদ নামের আন্দোলনে সমগ্র ইতিহাসের মুসলিমরা যে প্রকার সামাজিক-রাজনৈতিক মতাদর্শ পোষণ করত প্রায় তার সবগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হলো। এবং ইসলামকে মূল্যায়ণ করতে লাগলো আরব ঐতিহ্যের একটা উজ্জ্বল আবদান হিসেবে, সমগ্র মানবতার প্রতি খোদার চূড়ান্ত বাণী হিসাবে নয়।

এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে, উপরোক্ত জাতীয়তাবাদ তাদের জন্য গাত্রদাহের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল যারা ইসলামকে মুসলিম জীবনের ব্যক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে কার্যকরী বিষয় হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন। তারা মনে করতেন জাতীয়তাবাদ হলো একটা ধ্বংসাত্মক মতাদর্শ যেটা তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনকে ইসলামহীন করতে সক্ষম; এটা একটা অপশক্তি যেটা মুসলিমদের ঐক্য ধ্বংস করে সাম্রাজ্যবাদের শিকারে পরিণত করতে পারে; একটা ক্ষতিকর মতাদর্শ যেটা মানুষে মানুষে ভেদাভেদের প্রাচীর গড়ে তোলে এবং প্রত্যেক জাতিকে অন্য জাতির উপর আধিপত্য বিস্তারে উদ্বুদ্ধ করে; পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুদ্ধ এবং রক্তপাতের একটা প্রধান কারণ; সমগ্র বিশ্বকে একে অপরের প্রতি তীব্র শত্রুতামূলকভাবে বিভক্ত করতে একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

সাম্প্রতিক কালের ইসলামী চিন্তাবিদদের চিন্তাচেতনাকে জাতীয়তাবাদের চিন্তাচেতনার সঙ্গে তুলনা করলে প্রাথমিকভাবে যে ধারণার জন্ম **হয় সেটা** হলো যে, ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে যে কোন প্রকার সমঝোতা পুরোপুরিভাবে অসম্ভব। এমন ধারণাটা একেবারেই অমূলক না, বিশেষ করে যদি জাতীয়তাবাদকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যেটা মৌলিকভাবে ইসলামের সামাজিক-রাজনৈতিক মতাদর্শকে অস্বীকার করে। তবে ইসলামী চিন্তাবিদদের চিন্তাধারাকে আরো গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে মনে হবে তা দ্বিতীয় আরেকটা পরিণতির ঈঙ্গিত দেয়। জাতীয়তাবাদ ও জাতি নিরপেক্ষ মুসলিম ঐক্যের মধ্যকার সংকটকে সাধারণত যেভাবে ধারণা করা হয় তার চেয়ে অধিকতর ঠাণ্ডা মস্তিস্কে ও বাস্তবতার ভিত্তিতে তারা পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ ব্যাপারটা পরিস্কারভাবে ফুটিয়ে তুলতে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ও বিংশশতাব্দীর ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতামতের উপর একটা সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করবো।

এ লক্ষ্যে আমরা প্রথমে বিবেচনা করবো হাসান আল-বান্নার (মৃত্যু ১৯৪৯) প্রাসঙ্গিক কিছু লেখা যিনি ইখওয়ান আল মুসলিমুন এর প্রতিষ্ঠাতা এবং যিনি পাশ্চাত্যের অদ্ভুত "মৌলবাদী" ও "জঙ্গী" ইসলামী সংস্থার সঙ্গে পুরোপুরি একমত পোষণ করেন। অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদদের বিপরীতে আল-বান্না বিশ্বাস করতেন ইসলাম শুধুমাত্র মুসলিমদের জীবন ও ধর্ম বিশ্বাসই শুধু নয়, বরং ওটা তাদের পিতৃভূমি ও জাতীয়তাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেন যে, সকল ইসলামী ভূ-খণ্ডই হলো ইসলামী পিতৃভূমি। সামষ্টিক পরিচয় হিসাবে মুসলিমরা একক ও অবিভাজ্য এ ধারণার উপরও আল বান্না বিশাল গুরুত্বারোপ করেছেন।

> ইসলাম ভৌগলিক সীমানা এবং গোত্র ও রক্তের সম্পর্কের বিভিন্নতাকে স্বীকার করে না। ইসলাম মনে করে সমস্ত মুসলিম জনতা একই জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত এবং সমস্ত ইসলামী ভূ-খণ্ড একটা একক পিতৃভূমি (হাসান আল - বান্না, রিসালাত আল মু'তামার আল খামিছ, কায়রো, পৃষ্ঠা ৪৮)।

তিনি আরো বলেন - "প্রতিটা ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ড যেখানে কুরআনে বিশ্বাসী একজন মুসলিম ভ্রাতা বাস করে সেটা একই ইসলামী পিতৃভূমির একটা অংশ" (হাসান - আল - বান্না, আল রাসায়েল আস সালাস, কায়রো, পৃষ্ঠা ৭৩)।

এ কারণেই হাসান আল - বান্না শুধুমাত্র মিশরকেই নয় বরং সমগ্র মুসলিম ভূ-খণ্ড অথবা পারতপক্ষে আরব বিশ্বকে বিজাতীয় আধিপত্য থেকে মুক্ত করার ধারণায় বিশ্বাস করতেন (দেখুন আল - বান্না, বায়না আল আমস ওয়া আল-আওয়াম, কায়রো, পৃষ্ঠা ২৫)। একই কারণে তিনি মনে করতেন মুসলিম বিশ্বের কোন এক অংশ আক্রান্ত হওয়া অর্থ সমগ্র মুসলিম বিশ্ব আক্রান্ত হওয়ার নামান্তর (ইসহাক মুসা হোসাইনী, The Muslim Brethren, বৈরুত, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ৬৪)।

এ সমস্ত অবশ্য আল বান্নার চিন্তাধারার একটা দিক মাত্র। আল-বান্নার মতে, মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতি আনুগত্যতার অর্থ এ নয় যে, মিশরের প্রতি তার বিশেষ আনুগত্যের ব্যাপারটা উপেক্ষা করতে হবে। সম্ভবতঃ আল-বান্নার স্বপ্ন ছিল যে, মুসলিমরা বিভিন্ন প্রকার পরিচয়ের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে। কিন্তু কোন বিশেষ একটার প্রতি আনুগত্য অপরাপর আনুগত্যকে অস্বীকার করবে না। এটাকে তিনি এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, প্রত্যেক মুসলিমের প্রথমতঃ একটা বৃহৎ ও সাধারণ জাতীয়তা রয়েছে- সেটা হলো ইসলামী জাতীয়তা, খুবই মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য একজন মুসলিমের দু'টো দায়িত্ব রয়েছে-ইসলামী জাতীয়তার প্রতি তার সাধারণ দায়িত্ব এবং যে জনগোষ্ঠীর ভিতরে সে বাস করে তাদের প্রতি তার বিশেষ দায়িত্ব। আল-বান্না বলেছেন :

> ...ইখওয়ান তাদের বিশেষ জাতীয়তাকে শ্রদ্ধা করে এ কারণে যে এটা তাদের লালিত প্রতিরোধের প্রাথমিক ভিত্তি। তারা এটাকে ভুল মনে করে না যে, প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তার স্বদেশের জন্য কাজ করা এবং অন্য দেশের উপর তার দেশকে প্রাধান্য দেয়া। এরপর ইখওয়ান সমর্থন করে আরব ঐক্যকে (উপনিবেশবাদ) প্রতিরোধের দ্বিতীয় স্তর হিসেবে। তৃতীয় স্তরে তারা সংগ্রম করে আন্তঃ ইসলামের জন্য যেটা বৃহৎ ইসলামী পিতৃভূমি রক্ষায় প্রাচীর হিসেবে কাজ করবে (রিসালাত আল-মুতামার আল খামিস, পৃষ্ঠা ৪৯)।

তিনি "বিশেষ জাতীয়তাকে" সমর্থন করেছেন এ বলে যে, "ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তার স্বদেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে এবং যে জাতির মধ্যে বাস করতে তার প্রতি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে এবং আত্মীয়তা ও প্রতিবেশীসুলভতাকে প্রাধান্য দিতে। নিকটতমদেরকে যেহেতু প্রাধান্য দিতে হবে, সেজন্য ইসলাম একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এলাকার বাইরে যাকাত প্রদান করাকে সমর্থন করে না। সেজন্য একজন মুসলিম হলো গভীরভাবে দেশপ্রেমিক এবং স্বজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল। এটা এ কারণে যে স্বয়ং আল্লাহই এভাবে বিধান করেছেন। ... সেজন্য ইখওয়ানরা হলো তাদের পিতৃভূমির কল্যাণে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। তাদের স্বজাতির প্রতি সেবাতেই তারা সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গী। তারা এ মহৎ ও গৌরবময় দেশের জন্য সর্বপ্রকার শক্তি, গৌরব ও উন্নয়ন প্রত্যাশা করে" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৬)।

হাসান আল-বান্নার লেখা থেকে এটা পরিস্কার যে তিনি যেমন জাতীয়তাবাদী মতাদর্শকে বিরোধিতা করেছেন, তেমনি কিছু কিছু উদ্দেশ্যের প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন যেগুলো জাতীয়তাবাদীরাও অর্জন করতে চায়। এক্ষেত্রে তিনি বেশ কিছু পরিভাষার আবিস্কার করেছেন যেগুলো তাঁর এবং অন্যান্যদের, জাতীয়তাবাদীদেরসহ, কিছু সম্ভাবনাপন্ন উদ্দেশ্যের প্রতি ঈঙ্গিত করে। যেমন- আল-বান্না এটা পরিস্কারভাবে বলেছেন যে, তিনি ওয়াতানিয়্যাহ আল-হানিন (অনুরাগভিত্তিক জাতীয়তাবাদ)কে বিরোধিতা করেননি যার দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা। বিরোধিতা করা তো দূরের কথা, তিনি বরং মনে করতেন এ ধরনের ভালবাসা মানুষের প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত। প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে, হিজরতের পর বেলাল ও রাসূল (সাঃ) যখনই মক্কার কথা স্মরণ করতেন তখনই তারা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন। তেমনিভাবে আল-বান্না ওয়াতানিয়্যাই আল-হুরিয়্যাহ ওয়া আল-ইজজাহ (স্বাধীনতা ও আত্ম সম্মানের জাতীয়তাবাদ)কেও অস্বীকার করতেন না। এমন জাতীয়তাবাদ দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন একজন তার দেশকে স্বাধীন হিসেবে দেখা এবং তার অন্তরে স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানের প্রতি ভালোবাসাকে লালন করা। আল-বান্না ওয়াতানিয়্যাহ আল-মুজতামা (সমাজ সেবামূলক জাতীয়তাবাদ)কেও অস্বীকার করেননি। এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন একটা দেশের জনগণের মধ্যেকার বন্ধনকে দৃঢ় করা। তিনি বিশ্বাস করতেন, অনুমোদন না করা তো দূরের কথা, ইসলাম বরং এটাকে উৎসাহিত করেছে। একইভাবে আল-বান্নার মতে কাওমিয়্যাহ আল উম্মাহ হলো একজন ব্যক্তির প্রাথমিক দায়িত্ব তার স্বজাতির মানুষের প্রতি বর্তায়। তাঁর মতে এটাও ন্যায়সঙ্গত যে, একজন ব্যক্তি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথমে তার জাতির লোককে সেবা করবে (আল রাসায়েল আল-সালাস, পৃষ্ঠা ১৬-২১)।

যেহেতু মুসলিম বিশ্বের জাতীয়তাবাদীরা সাধারণতঃ আন্তঃইসলামবাদ এর বিরোধিতা করেছেন তাই এটা দেখা গুরুত্বপূর্ণ যে আন্তঃইসলামবাদীরা, হাসান আল-বান্নাসহ, কি ধরনের ইসলামী ঐক্যের স্বপ্ন দেখতেন। প্যান-ইসলামী আন্দোলন এর ব্যাপারে প্রথমেই যে বিষয়টা খটকা লাগে সেটা হলো যে, যদিও এটা একটা বিশেষ চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব

করে এবং বিশ্বের মুসলিমদের কোন্ দিকে ধাবিত হওয়া উচিত-মুসলিম ঐক্য তার সাধারণ দিক নির্দেশনা দিয়েছে, তথাপি এ ব্যাপারে সুসংগঠিত রাজনৈতিক পদক্ষেপ নির্দেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য প্যান-ইসলামবাদ অর্থ এটাও ছিল যে,সমস্ত মুসলিম দেশগুলো একটামাত্র ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া। এমনকি প্যান-ইসলামী মতবাদের সবচেয়ে ঘোর প্রবক্তা জামালুদ্দিন আফগানী (মৃত্যু ১৮৯৭) আলবার্ট হোরানীর ভাষায় "মনে এটা ধারন করতেন না একটামাত্র ইসলামী রাষ্ট্র সৃষ্টি করা বা পূর্বেকার ইসলামী খিলাফতের পুনঃপ্রবর্তন করা।" (Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age*, London, Oxford University Press, 1962, P. 116))। মুহাম্মদ আবদুহ (মৃত্যু ১৯০৫) আফগানীর প্রধান শিষ্য ছিলেন, তিনি এমন ধারণা পোষণ করতেন না। বর্তমান যুগের জন্য বাস্তবভিত্তিক মুসলিম ঐক্যের যে কল্পনা তিনি করেছিলেন সেটা (তাঁর সময়ের) জার্মান রাষ্ট্র কাঠামোর সাথে সাদৃশ্য রাখে। জার্মান রাষ্ট্রগুলো যদিও স্বাধীন ছিল কিন্তু একক অস্তিত্বের অধিকারী ছিল (রাশিদ রিদা, *তারিখ আল-উসতাজ আল-ইমাম*, প্রথম খণ্ড, ১৯৩১, পৃষ্ঠা ৩০৬)।

হাসান আল-বান্নার কথায় ফিরে এসে আমরা আবারো দেখতে পাই যে, অন্যান্য ইসলামীবাদীদের মত তিনিও "ইসলামী পিতৃভূমির সকল অংশকে, যেগুলো পশ্চিমা শক্তির প্রভাবে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তার একত্রীকরণকে" দৃঢ়ভাবে সমর্থন করতেন (ইলা আল শাবাব, কায়রো, পৃষ্ঠা ৯)। তথাপি এ একীভূতকরণও সকল ইসলামী রাষ্ট্রের একটামাত্র রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার অর্থে ছিল না। এ একীভূতকরণ বলতে যেটা বুঝানো হতো তা হলো মুসলিম দেশগুলো শুধুমাত্র তাদের নিজ নিজ সমস্যা নিয়েই নিমগ্ন না থেকে বরং সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের সমস্যা সমাধানে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে আল-বান্না একটা মুসলিম জাতিসংঘের (হাইয়াত আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যাহ) প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেটা আরব-অনারব সকল মুসলিম দেশকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যদিও এমনতর একটা সংস্থা সম্পর্কে পরিস্কার কোন ধারণা পাওয়া যায় না, তারপরও যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় সেটা নির্দেশ করে যে, এমন সংস্থা কম-বেশ আরব রাষ্ট্র সংস্থার (League of Arab States) সাথে কিছুটা মিল রাখে, তবে তা সমগ্র মুসলিম দেশগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করবে (*আল বান্না, মুশকিলাতুনা ফি দাওয়া ইলা আল-নিযাম আল ইসলামী*, কায়রো, পৃষ্ঠা ৩৫)।

এ পর্যায়ে এ বিষয়টাকে আরো বিশ্লেষণ করার জন্য আরব বিশ্বের একজন বরেণ্য ইসলামী আইনজ্ঞ মুহাম্মদ আবু জাহরা প্যান-ইসলাম বিষয়ে কি মতামত পোষণ করেন তার উপর সম্যক আলোকপাত করা জরুরী। আল মুসলিম পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ধারাবাহিক প্রবন্ধ "*আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়্যাহ*" (প্যান-ইসলাম)-তে ইসলামী ঐক্যের কাঠামোর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অন্যান্য ইসলামীবাদীদের মত আবু জাহরাও প্যান-ইসলামের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তবে আবু জাহরা ইসলামের

রাজনৈতিক ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, একরাষ্ট্র ভিত্তিক ইসলামী ঐক্যের মতাদর্শটা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। তিনি এমনকি এটাও বলেছেন যে, এটা আসলে বেশিদিন টিকতেও পারে না। এমন ঐক্য শুধুমাত্র সম্ভব ছিল তখন যখন ইসলাম "আরব ভূমির" বাইরে বিস্তার করেনি। যখন বিশাল বিস্তৃত ভূ-সীমানাকে বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামী শাসনাধীনে নিয়ে আসা হলো তখন একটা রাষ্ট্রের কাঠামোতে ঐক্য ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়লো। এটাকে একটা স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে আবু জাহরা ধরে নিয়েছেন বলে মনে হয়। সেজন্য, একরাষ্ট্রভিত্তিক ইসলামী ঐক্যের পরিবর্তে তিনি মতামত পেশ করেছেন সকল মুসলিম রাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটা ইসলামী লীগ গঠন করা। আবু জাহরার মতে এমন একটা ইসলামী লীগ ইসলামী বিশ্বকে নিম্নোক্তভাবে একতাবদ্ধ করবে–

১. আবু জাহরার মতে এটা একটা ইসলামী রাজনৈতিক ইউনিয়ন গঠন করবে যেটার থাকবে একটা কাউন্সিল যা অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি মুসলিম রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির সাজুয্যতা নির্দেশ করবে।

২. অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ইসলামী দেশগুলো এমন একটা অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করবে যেটা ইউরোপ, আমেরিকা বা রাশিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত বা নির্ভরশীল হবে না। এটা এজন্য যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যাতে অন্যান্য অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর উচ্ছিষ্ট হয়ে থাকবে না বরং তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করতে পারবে।

৩. এটা একটা ভাষাগত ঐক্যের জন্ম দেবে যার ভিত্তি হবে "কুরআনের ভাষা" এবং এ ঐক্যের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐক্যের সৃষ্টি হবে।

আবু জাহরা এটাও প্রত্যাশা করেন যে, ইসলামী লীগ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব রক্ষায়ও কার্যকর হবে। এ লক্ষ্য অর্জনটা হতে পারে ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ এড়ানো অথবা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংঘর্ষ পরিহার করার মাধ্যমে।

আবু জাহরা যে ঐক্যের ধারণা পোষণ করেন সেটা কুরআনিক আইনের উপর ভিত্তিশীল হবে। ঐক্যের সাধারণ মন্ত্র হবে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, যদিও রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা থাকবে তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরকার কাঠামো মেনে চলা, আবু জাহরার মতে, জামালুদ্দীন আফগানীও একই মতামত পোষণ করতেন (আধুনিক বিশ্বের ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে যারা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে একটা মাত্র রাষ্ট্রে একীভূত করতে একমত পোষণ করেন না, তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন James P. Piscatori, *Islam in a World of Nation States*, Cambridge, Cambridge University Press, বিশেষতঃ ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়।)

॥ ৫ ॥

সারা বিশ্বের মত একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মুসলিমরা আজও একাধিক পরিচিতির সমস্যায় পীড়িত। এ ব্যাপারটা দাবি করে যে তাদের চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক নেতারা সত্যিকারভাবে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যেটা প্রত্যেক মুসলিমকে মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাদের নিজস্ব ভৌগলিক ও নৃ-জাতিক পরিচয়ের প্রতি, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে তার স্ব-জাতীয় নাগরিক এবং ব্যাপক অর্থে সমগ্র মানব জাতির প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে মুসলিমরা একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছিল। মুসলিম বিশ্বের একটা বিরাট অংশে ধর্মহীন জাতীয়তাবাদ প্রভাবশালী মতাদর্শ হিসেবে প্রাধান্য পাচ্ছে এবং আন্তঃজাতীয় মুসলিম ঐক্যের ধারণা দৃশ্যতঃ বিস্তৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে যে, ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি লণ্ডনের The Economist পত্রিকা তৎকালে অনুষ্ঠিত একটা আন্তঃইসলামী সম্মেলন - সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে মন্তব্য করেছিল এ বলে যে, এটাই এমন ধরনের সর্বশেষ সম্মেলন। ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের আরব-ইসরাইলী যুদ্ধের পর থেকে স্রোত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করলো এবং পর্যায়ক্রমে মুসলিম ঐক্যের ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। এ অনুভূতিটা সর্বশেষে বেশ কয়েকটা আন্তঃইসলামিক সংস্থায় রূপ লাভ করল, বিশেষতঃ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC)। তবে এটা সত্য যে ইসলামী ঐক্য আজও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কার্যকরভাবে পরিস্ফুট হয়নি। তবে বারংবার মুসলিমরা প্রকাশ করেছে যে মুসলিম ঐক্যের প্রত্যাশা তাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয়। মুসলিম দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি এ বিষয়টাকে উপেক্ষা করে নীতি নির্ধারণ করে তবে এটা হবে অবাস্তব দৃষ্টি-অন্ধত্ব।

সেজন্য এটা অতীব প্রয়োজন যে, মুসলিম চিন্তাবিদগণ মুসলিম উম্মাহর পরিচিতির সমস্যা সমাধানে নতুন কার্যকর ধ্যান-ধারণা পেশ করা। এ সমস্যার সমাধানে মুসলিমদের উচিত তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দিকে ফিরে যাওয়া, বিশেষতঃ কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত হওয়া। অবশ্য জীবনের যেসব ক্ষেত্রে এমন ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় যার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় সে সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা বাস্তবায়নে অধিকতর প্রজ্ঞা, বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান এবং দূরদৃষ্টির প্রয়োজন। এবাদত বন্দেগী সম্পর্কিত ব্যাপারে কালের পরিবর্তন সামান্যই প্রভাব ফেলে। বর্তমান আলোচিত সমস্যার ব্যাপারে এটা বলা গুরুত্বপূর্ণ যে, এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসের দিক নির্দেশনা অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় অনির্দিষ্ট, পরোক্ষ ও অবিস্তারিত। এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনাগুলো মূলতঃ নীতি-দর্শন ও আদর্শভিত্তিক, বিস্তারিত নিয়ম-নীতিমূলক নয়।

আমাদের আলোচ্য সমস্যাগুলোর সমাধানে যেটা প্রয়োজন সেটা হলো মুসলিম বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাবিদদের উচিত প্রথমতঃ কুরআন ও হাদিস থেকে এতদসংশ্লিষ্ট ধারাগুলোকে খুঁজে

বের করা, এবং ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলিম বিশেষজ্ঞরা কিভাবে সেগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন এবং পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটকে তাঁরা কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন তার মূল্যায়ন করা। এটাও দেখা প্রয়োজন ঐ সকল বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রদত্ত চিন্তাদর্শনের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কতটুকু প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে। সবশেষে, এটাও দরকার যে, আধুনিক যুগের বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা, যেমন-দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিরাজমান ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ, আধুনিক জীবনের নিরেট বাস্তবতা, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির জটিলতা এবং বিভিন্ন প্রকার সাংঘর্ষিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা। এসব প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো পূর্ণ না হলে উক্ত সমস্যার সমাধানে ইসলামী চিন্তাধারা বিশেষ কোন অবদান রাখতে সক্ষম হবে না। আশা করি নব্য ও সতেজ চিন্তাধারার প্রবাহ যখন বইতে শুরু করবে তখন মুসলিম উম্মাহ সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য এবং অফুরন্ত উদ্যম সহকারে একটা নবজীবনের চেতনায় আন্দোলিত হবে। এমন চিন্তা-চেতনা আশা করা একই সঙ্গে হবে মূলতঃই ইসলামী এবং বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও ফলপ্রসূ। এটা হবে একই সময়ে "মূলধারার" (Traditional) এবং সৃষ্টিধর্মী। এটা ঐতিহ্য সংরক্ষণের চেতনাকে নবসৃষ্টির উদ্যমের সাথে সম্পৃক্ত করবে এবং অকলুষিত পথে এগিয়ে চলতে প্রেরণা সঞ্চার করবে। এটা হবে সুদৃঢ়ভাবে অতীতে গ্রোথিত কিন্তু তবুও মুসলিম উম্মাহর অমূল্য ও অপার বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যে মনুষ্য অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত কল্যাণকর নব্য কোন কিছু যোগ করতে দ্বিধা করবে না। কুরআনের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এমন চিন্তাধারা নবসৃষ্টির চেতনায় উদ্বেলিত হবে। নতুন নতুন পর্যবেক্ষণের জন্ম দেবে, ইসলামের ভিশনকে বাস্তবে রূপ দিতে নতুন কাঠামোর প্রবর্তন করবে এবং সমগ্র মানবতার কল্যাণে অবদান রাখবে। অতীতে অর্জিত সফলতার কারণে ইতিহাসের গতি পরিবর্তনে এবং মানব সভ্যতায় অধিকতর অবদান রাখতে ইসলামের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের ঐ অন্তর্নিহিত ক্ষমতা পূর্ণরূপে প্রকাশ পেতে পারে। কারণ, শতশত নতুন দুনিয়া এবং অসীম সম্ভাবনাময় নব নব যুগের ইঙ্গিত কুরআনের আয়াতগুলোতে লুকিয়ে আছে, যেমন মুহাম্মদ ইকবাল বিশ্বাস করতেন। শুধুমাত্র মুসলিম জাতি যদি তাদের বিশ্বাস ও লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণে সক্ষম হয় তবে একটা সম্পূর্ণ নতুন জগত ও নব্য যুগের সূচনা করবে বিশ্ব ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে।

ইসলামাবাদ
ডিসেম্বর ১৯৯১
জমাদিউস্‌সানী ১৪১২

জাফর ইসহাক আনসারী

মুখবন্ধ

সমকালীন ইতিহাসে জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রশ্ন মানবতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংকট রূপে প্রতিভাত হয়েছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার অসংখ্য বিজ্ঞজন কর্তৃক যথেষ্ট অভিনিবেশ প্রয়োগ সত্ত্বেও এ বিষয়টা এখনও বিতর্কিতই রয়ে গেছে। বর্তমান গবেষণাকর্মটা উদারপন্থা, মার্কসবাদ ও ইসলাম এ তিন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারার বিংশ শতকীয় চিন্তাবিদদের মতামতের একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা। এ পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হলো প্রথমতঃ আলোচ্য বিষয়ে বিভিন্ন চিন্তাধারার পরিগণ্ডিতে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং দ্বিতীয়তঃ পরস্পরের মূল্যবোধের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকে একটা সত্যিকার আন্তর্জাতিক সংলাপের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা। একটা অধিকতর শান্তিপূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এ পদক্ষেপ দুটো নিঃসন্দেহে অতীব প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।

বর্তমান গবেষণাটা, যেটা মূলতঃ ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত International Institute of Islamic Thought কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়েছিল, বিশ্বব্যবস্থা বিষয়ক মতবাদ নামক একটা বৃহত্তর প্রকল্পের অংশ। এ প্রকল্পটার বাস্তবায়নে জড়িত ছিলেন Hayward R. Alker, Jr. (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA), Thomas J. Biersteker (University of Southern California, Los Angeles), Takahashi Inuguchi (University of Tokyo) এবং Tahir Amin (Quaid-i-Azam University, Islamabad)। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন চিন্তাধারার আলোকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতিটা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা। এর লক্ষ্য শুধুমাত্র বিকল্প বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীগুলোর (World-views) মৌলিক ধারণা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি অর্জনই নয়, বরং একটা কার্যকর আন্তর্জাতিক সংলাপের অবদান রাখাও এর উদ্দেশ্য।

আমি আন্তরিকভাবে Hayward R. Alker Jr., Thomas J. Biersteker এবং Takahashi Inuguchi এর প্রতি কৃতজ্ঞ তাঁদের মূল্যবান মন্তব্যের জন্য যার ভিত্তিতে রচিত এ গবেষণার একটা পূর্ব সংস্করণ ১৯৮৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়াতে অনুষ্ঠিত International Studies Association এর বার্ষিক মিটিং-এ উপস্থাপন করা হয়েছিল। ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত International Institute of Islamic Thought আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারী যারা আমাকে গঠনমূলক পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, বিশেষতঃ জাফর ইসহাক আনসারী, ইজায গিলানী, আনোয়ার সিদ্দিকী, আনিস আহমেদ এবং আরো অনেকে। ঐ সেমিনারে পঠিত আমার প্রবন্ধে সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য নাজরী শুকরী এবং নাজিফ শাহরানীও বিশেষভাবে ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। সর্বোপরি জনাব জাফর ইসহাক আনসারীর অবিরাম তাগিদ, খুঁতসন্ধানী সমালোচনা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ সম্পাদনাই এ গ্রন্থ বর্তমান আকারে প্রকাশ পেয়েছে। পরিশেষে, আমি তাহির ফারখান আহমদের প্রতি কৃতজ্ঞ অতীব ধৈর্য্য সহকারে এ গ্রন্থ পুনঃপুনঃ টাইপ করার জন্য।

ইসলামাবাদ
ডিসেম্বর ১৯৯১

তাহির আমিন

ভূমিকা

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার বিজ্ঞজনেরা জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ বিষয়ে বহুকাল ধরে গভীরভাবে গবেষণা করে আসছেন। বিখ্যাত পশ্চিমা ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টোয়েনবি, যিনি জাতীয়তাবাদকে ইতিহাসে একটা নেতিবাচক শক্তি হিসেবে গণ্য করতেন, তিনি এটাকে কেবলমাত্র একটা ক্রান্তিকালীন ব্যাপার বলে কল্পনা করেছিলেন এবং মনে করতেন যে পশ্চিমা উদার আন্তর্জাতিকতাবাদের আধিপত্যই জীবনের বাস্তবতা। কার্ল মার্কস, যিনি **মার্ক**সীয় ধারার প্রবর্তক তিনিও জাতীয়তাবাদকে একটা ক্ষণস্থায়ী পর্যায় বলে ধারণা **পোষ**ণ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে ইতিহাসের প্রবাহ অবশেষে সর্বহারা শ্রমিক **সম্প্র**দায়ের আন্তর্জাতিকতাবাদে রূপলাভ করবে। মুহাম্মদ ইকবাল যিনি সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের একজন সুপরিচিত দার্শনিক তিনিও (জাতীয়তাবাদকে ছাড়িয়ে) অদূর ভবিষ্যতে **একটা** আধিজাতিক (Supra-national) বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়-উম্মাহ এর উত্থানের **স্বপ্ন** দেখেছিলেন। এ সমস্ত উদারপন্থী, মার্কসবাদী কিংবা ইসলামী চিন্তাবিদ বস্তুতঃ জাতীয়তাবাদের অনতিবিলম্বে ধ্বংস এবং তাঁদের নিজ নিজ ধারার আন্তর্জাতিকতাবাদের বিজয়ের ব্যাপারে অকালপক্ক দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন।

যাই হোক, জাতীয়তাবাদের আবর্তনশীল উদ্ভব এবং এর নিরবচ্ছিন্ন তেজদীপ্ততা ঐসব দার্শনিকদের প্রত্যাশাকে হতবুদ্ধি করেছে। জাতীয়তাবাদের ইতিহাসকে বৃহৎ বিবেচনায় বিশ্বব্যাপী তিনটা তরঙ্গ প্রবাহে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম তরঙ্গ প্রবাহটা শুরু হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) মধ্য দিয়ে যেটা পশ্চিমা অবয়বকে পাল্টে দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করেছিল। দ্বিতীয় প্রবাহটা শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে এবং বিস্তার লাভ করেছিল ১৯৭০ দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। এ প্রবাহটা উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকাংশকে উপনিবেশিকতামুক্ত করে স্বাধীন হতে সাহায্য করেছিল। আর সর্বশেষ বা তৃতীয় প্রবাহটা ১৯৭০ এর দশকে নৃ-জাতীয়তা আন্দোলনের আদলে উদ্ভব হয়ে বর্তমানে সারা বিশ্বকে প্রভাবিত করে চলছে। এটা জাতীয়তাবাদ বিষয়ক কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যেগুলো ইতোপূর্বে উত্থাপন করা হয়েছে এবং তার উত্তরও দেয়া হয়েছে, তথাপি ঐ প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে নতুন করে ভাবতে বাধ্য **করে**। সে প্রশ্নগুলো যেমন, জাতীয়তাবাদ কি? কেন এটা এমন শক্তিশালী বিষয় হিসেবে **চলে** আসছে? জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র কি চিরস্থায়ী হিসেবে বেঁচে থাকবে? আন্তর্জাতিকতাবাদের সফলতার কোন আশা করা যায় কি?

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ উভয় বিষয়ে তিনটা ভিন্নধর্মী সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা তথা-উদারপন্থা, মার্কসবাদ ও ইসলামের আলোকে তদীয় চিন্তাধারাগুলো তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করবো।

এ গবেষণার গুরুত্ব

জাতীয়তাবাদের গবেষণার গুরুত্ব তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক উভয়ভাবেই নিরূপণ করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হওয়ার কারণে জাতীয়তাবাদ নামক বিষয়টাকে খুব ভালভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এটা রাষ্ট্রের সীমানাকে জাতীয়তার ভিত্তিতে পুনঃচিত্রায়ন করে বিশ্বরাজনীতির কাঠামোকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। তদুপরি এটা জাতিগত বৈরিতার উদ্ভব, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিগ্রহ এবং দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার উন্নয়নে এটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে এটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গতিধারাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে চলছে। তথাপি এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিকেরা জাতীয়তাবাদ গবেষণায় অপ্রতুল মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত সাম্প্রতিক মূল্যায়ন এটাই নির্দেশ করে যে, এ বিষয়ে আমাদের অনুধাবনের মাত্রা নিতান্তই অপরিপক্ক(Undeveloped)।

বাস্তব অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে এ গ্রন্থ নিম্নের গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্নগুলো আলোচনা করবেঃ জাতিরাষ্ট্রই কি মানব সংঘবদ্ধতার একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ রূপ? মনুষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও আদান-প্রদানের উপর একক ও একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারকারী জাতিরাষ্ট্রের কাছে কি মানবজাতি অত্যাবশকীয়ভাবে বন্দি হয়ে থাকবে? আমরা কি সর্বদাই জাতিরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধায়কগণ কর্তৃক আরোপিত পাসপোর্ট, ভিসা বা অন্যান্য সীমাবদ্ধতার বেড়াজালে আবদ্ধ থাকবো? জাতিরাষ্ট্রের বিকল্প অন্য কোন ব্যবস্থা আদৌ আছে কি?

বিশ্বব্যবস্থায় সাম্প্রতিক বেশকিছু পরিবর্তন নির্দেশ করে যে, বিভিন্ন প্রকার আন্তর্জাতিকতাবাদকে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পাশ্চাত্য জগত ইতোমধ্যেই তার জাতিরাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে আধিজাতিক (Supranational) মানবগোষ্ঠী গঠনের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। ইরাক এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন মিত্রশক্তির মধ্যকার সাম্প্রতিক (১৯৯১) উপসাগরীয় যুদ্ধে যেভাবে দেখা গেছে তাতে প্রতিভাত হয় যে, পাশ্চাত্য বিশ্বের দেশগুলোর পররাষ্ট্রনীতিগুলো একই সাংস্কৃতিক কাঠামোতে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। ইউরোপকে একটা একীভূত আধিজাতিক গোষ্ঠীতে পরিণত করতে (ইউরোপীয়) দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিচার্য বিষয়গুলোতেও গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব একটা যুগসন্ধিক্ষণ অতিক্রম করছে। এ মুহূর্তে এ ব্যাপারে অনুমানমূলক ভবিষ্যৎবাণী করা দুস্কর তথাপি এটা প্রতীয়মান হয় যে, সোভিয়েত রাশিয়া এবং এর সাবেক পূর্ব ইউরোপীয় সাম্রাজ্য উভয়ই একটা বৃহৎ রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে এবং নৃ-জাতিক ভিত্তিতে বৃহত্তর খণ্ড-বিখণ্ডতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এটাও সম্ভব যে, সোভিয়েত রাশিয়া এবং তার পূর্ব-ইউরোপীয় একান্ত মিত্র দেশগুলো পুরোপুরিভাবে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারকে বর্জন করে পাশ্চাত্য বিশ্বের ধারায় মিশে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। অবশ্য এ গ্রন্থে আমাদের বিশ্লেষণে মার্কসবাদী চিন্তাধারাকে

পশ্চিমা ধারার একটা অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাই এটা আশ্চর্যজনক কোন ব্যাপার হবে না যদি ইতোপূর্বের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো নতুন মিত্র শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিমা বিশ্বের পাশাপাশি সহযোগী শক্তির (Junior Partner) ভূমিকা পালনে একমত হয়।

মুসলিম বিশ্বের ব্যাপারে এ কথা বলা যায় যে, এটা দুটো ধারার মধ্যে বন্দি হয়ে আছে। এর প্রথমটা হলো জাতি-রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যতা যেটা উপনিবেশিক আমল থেকে চলে আসা একটা ধারা এবং যেটা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এখনো শক্তিশালী রূপে বিরাজ করছে। অন্যপক্ষে, দ্বিতীয় ধারাটা হলো (মুসলিম বিশ্বে) ইসলামী পুনর্জাগরণ, সামাজিক স্তরে এটি ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করেছে যার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো একটা একীভূত বিশ্ব মুসলিম সমাজ (উম্মাহ) গঠন করা। এ ব্যাপারটাও সাম্প্রতিককালের (১৯৯১) ইরাক ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন মিত্রশক্তির মধ্যকার পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। এ ঘটনায় ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ইরাকি নীতি-নির্ধারকেরা ইসলামী পুনর্জাগরণের লক্ষণকে কাজে লাগাতে এবং মুসলিম বিশ্ব-ব্যাপী ক্ষণস্থায়ী একটা গণসহানুভূতিকে (তাদের স্বপক্ষে) ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছিল। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এটার দ্বারা অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, তারা ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদের মোকাবিলায় খুবই দুর্বল।

সাংস্কৃতিকভাবে বহুমাত্রিক এসব আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে কি পারস্পরিক মতবিনিময় সম্ভব? আমরা বিশ্বাস করি যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক অধিকাংশ চিন্তা-গবেষণা, সেটা উদার, মার্কসীয় বা ইসলামী চিন্তাধারা যেটারই হোক না কেন মূলতঃ গোষ্ঠীগত আন্তর্জাতিকতাবাদে দুষ্ট। গোষ্ঠীগত আন্তর্জাতিকতাবাদ বলতে আমরা বুঝাতে চাচ্ছি যে, পারস্পরিক সহযোগিতার এমন একটা ভিত্তি যেটা জাতিরাষ্ট্রের সংকীর্ণ সীমানাকে ছাড়িয়ে যায় কিন্তু আবার সীমাবদ্ধ থাকে এমন কতকগুলো সমজাতীয় দেশের গণ্ডির ভিতরে যাদেরকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে একটা গোষ্ঠী হিসেবে ভাবা যায়। ঐ সমস্ত চিন্তা গবেষণায় বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন আন্তর্জাতিকতাবাদের আলোচনা খুবই সামান্য অথবা একেবারে নেই বললেই চলে। বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিকতাবাদ বলতে আমরা বুঝাতে চাই সর্বজন সমর্থিত এমন একটা বিশ্বব্যবস্থা যেটা সাংস্কৃতিকভাবে বহুধাবিভক্ত গোষ্ঠীর ভিতরে সমভাবে বিরাজমান এমন কতকগুলি সুনির্দিষ্ট মৌলিক মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত। এ গ্রন্থের অনেকগুলির মধ্যে একটা উদ্দেশ্য হলো বিভিন্নমুখী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীগুলোর (World-views) ব্যাপারে সচেতনতা এবং উপলব্ধি সৃষ্টি করা। আমরা আশাবাদী যে, বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক চিন্তাধারাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক উপলব্ধি একে অপরের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলবে এবং অধিকতর শান্তিময় সার্বজনীন বিশ্বব্যবস্থা তৈরি করতে সহায়তা করবে।

প্রধান যুক্তিসমূহ

জাতীয়তাবাদ বিষয়ক প্রচলিত সাহিত্যকর্মে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো মানবজাতি প্রকৃতিগতভাবে জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত এবং জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থার নিরন্তর আধিপত্যতার

প্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদ একটা পদ্ধতিগত এবং আত্মপুনর্জননশীল পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। এ মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টা আবার (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বে) নব-বাস্তববাদ তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যায় যেটা বর্তমান পাশ্চাত্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কীয় তত্ত্ব-বিতর্কে (Discourse) প্রভাবশালী ধারা। এ জাতিরাষ্ট্রের ধারণা দিয়েই তারা তত্ত্বের সূত্রপাত করে এবং মনে করে যে, জাতিরাষ্ট্রই সার্বজনীন কাঠামো।

উদারপন্থাবাদ, মার্কসবাদ ও ইসলাম এ তিন চিন্তাধারার আলোকে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ বিষয়ক আধুনিক গবেষণা কর্মের জরিপের উপর নির্ভর করে বর্তমান গ্রন্থ দুটো মৌলিক যুক্তির অবতারণা করে। প্রথমতঃ জাতীয়তাবাদ হলো রাজনীতির একটা বিশেষ ধাঁচ যেটার উপর অধুনা পশ্চিমা আন্তর্জাতিক পদ্ধতি উদ্ভূত পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তারকারী পশ্চিমা উদার সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার মধ্যে নিহিত। এটা প্রাকৃতিক স্বভাবজাত কোন কিছু নয়, তেমনি এটা চিরন্তনী কোন মতবাদও নয়। এটা শুধুমাত্র একটা যুগপৎ ঘটনা যে পাশ্চাত্য বিশ্বের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের আদর্শ হিসেবে এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণে জাতীয়তাবাদ সারা দুনিয়ায় জনপ্রিয়তা লাভ করছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন কোণের নানান ধরনের গোষ্ঠীগত আন্তর্জাতিকতাবাদ দ্বারা এর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এখন মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন। গোষ্ঠীভিত্তিক আন্তর্জাতিকতাবাদের একটা উদাহরণ ইসলামী পুনর্জাগরণবাদের উপর ভিত্তি করে যুক্তি দেখানো হয় যে, বিশ্ব জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশের অধিকারী মুসলিম বিশ্বে জাতীয়তাবাদ ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে তীব্র লড়াইয়ে নিমজ্জিত সেটার ফলাফল এখনো অনির্ধারিত। তবে উদারপন্থী এবং মার্কসবাদী উভয় ধারার পর্যবেক্ষকগণ এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ইসলামের পুনর্জাগরণই হলো বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ আন্তঃদেশীয় বিষয়। এটা বেশ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছিল ১৯৭৯ সালের ইরানের ইসলামী বিপ্লবে। যদিও এ বিপ্লবের আন্তঃ ইসলামী বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রমান্বয়ে সংকীর্ণ গোত্রচেতনা দ্বারা ম্লান হয়ে গিয়েছিল, যে চেতনা ক্রমাগতভাবে তার নীতি নির্ধারণে চিত্তাকর্ষক একটা উপাদানে পরিণত হয়েছিল। তথাপি সন্দেহাতীতভাবে এ বিপ্লবের ইসলামী তথা আন্তঃইসলামী বৈশিষ্ট্যাবলীই ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে প্রাথমিকভাবে একটা ব্যাপক গণভিত্তি রচনা করেছিল। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ এবং ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরে চলমান মুসলিমদের মুক্তি সংগ্রাম এসবগুলোই দুনিয়াব্যাপী মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছে। উপরোক্ত সকলক্ষেত্রে প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদ দ্বারা এর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামী গোষ্ঠীগত আন্তর্জাতিকতাবাদ বিষয়ে উদারপন্থী এবং মার্কসবাদ উভয় ধারাতেই একটা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। "মৌলবাদ" (Fundamentalism) শব্দটা পশ্চিমে সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় ইসলামী পুনর্জাগরণকে মন্দভাবে আখ্যায়িত করার জন্য। এর মাধ্যমে এটা বুঝানো হয় যে, মুসলমানরা উল্টোরথে চলে আদিমযুগে ফিরে যেতে চায়। এ গ্রন্থে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, এটা একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা এবং এটা পশ্চিমা পণ্ডিতদের সুগভীর নৃ-কেন্দ্রিক সংকীর্ণতার প্রতিফলন। আমাদের যুক্তি হলো যে, ইসলামী পুনর্জাগরণবাদ উদারপন্থী এবং মার্কসবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদ, যেটা পশ্চিমের

দুটো সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ এবং পাশ্চাত্য পরিচিতির অভিব্যক্তি-এতদ্বয়ের বিরুদ্ধে একটা সাড়ামূলক মনোভাব। অধিকন্তু, ইসলাম হলো একটা বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী (World-view) যেটা ইসলামের নিজস্বতা দিয়েই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করা সম্ভব।

উপরোক্ত তিনটা চিন্তাধারা তথা উদারপন্থাবাদ, মার্কসবাদ ও ইসলাম এদের প্রত্যেকেরই আছে সুগভীর আধিবিদ্যামূলক ধারণা-বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল একেকটা নিজস্ব বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী এবং সুস্পষ্ট সার্বজনীন দাবি যথানুসারে তারা বিশ্ব ব্যবস্থাকে সাজাতে কিংবা পুনর্গঠন করতে চায়। উপদারপন্থাবাদ হলো পাশ্চাত্যের প্রভাবশালী আধিপত্যবাদী মতবাদ। মার্কসবাদ, যেটা নিজেও একটা পশ্চিমা মতবাদ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় উদারপন্থাবাদের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি একটা অদমনীয় চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। ইসলামের ব্যাপারে বলা যায় যে, এটার পুনর্ভাব হয়েছে পাশ্চাত্যে উভয় মতবাদের বিরুদ্ধে একটা তীব্র সম্ভাবনাময় ও ক্ষমতাসম্পন্ন চ্যালেঞ্জ হিসেবে। নিচের সারণী নং-১ উপরোল্লিখিত চিন্তাধারাত্রয়ের মৌলিক বিভাগগুলোর সারমর্ম তুলে ধরেছে।

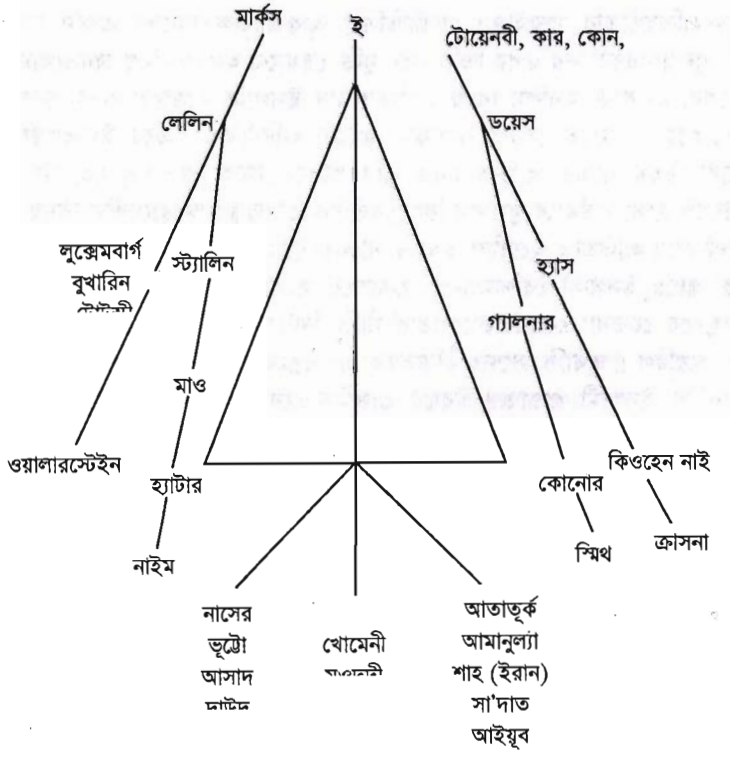

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতবাদের তিনটি ধারা

সারণী-১ : তিন চিন্তাধারার মৌল বিন্যাস

	উদারপন্থা	মার্কসবাদ	ইসলাম
সাংস্কৃতিক	জাতীয়তাবাদ/ আন্তর্জাতিকতাবাদ	শ্রেণীহীন সমাজ	উম্মাহ
রাজনৈতিক	উদার গণতন্ত্র	বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র	শুরা
অর্থনৈতিক	প্রবৃদ্ধি/আধুনিকায়ন	শোষণের মুলোৎপাটন	ন্যায়বিচার

টমাস কুন (Thomas Kuhn)-এর পরিভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে, উদারপন্থাবাদ, মার্কসবাদ ও ইসলাম এ চিন্তাধারাত্রয়ের প্রত্যেকের নিজস্ব মৌলিক ধারণা-প্রত্যয়গুলোর সমন্বয়ে একেকটা চিন্তা- গণ্ডী (Paradigm) আছে। প্যারাডাইম বলতে বুঝানো হয়, "একটা জনগোষ্ঠী কর্তৃক লালিত তাদের যাবতীয় বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ, জীবনযাপন প্রণালী ইত্যকার সবকিছুর একটা সামগ্রিক অবয়ব।" মৌলিক বিভাগ সমৃদ্ধ উপরোক্ত সারণীটা বিভিন্ন প্রকার চিন্তা–ধারার তুলনামূলক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেছে।

উদারপন্থাবাদ বিশ্বাস করে যে, জাতীয়তাবাদ একটা স্বভাবজাত মতবাদ আর তাই এটা জাতিরাষ্ট্র নামক স্বতঃসিদ্ধ সত্ত্বার মাধ্যমে বিশ্ব-ঐক্য অর্জন করতে চায়। এ মতবাদের প্রবক্তারা মনে করেন যে, মানবজাতি বিভিন্ন গোত্র, ভাষা এবং বর্ণে প্রাকৃতিকভাবে বিভক্ত; তাই জাতি রাষ্ট্রগুলোর উচিত হবে অবশ্যই তাদের সংঘবদ্ধ হয়ে প্রকৃতির ঐ সমস্ত বিভাজন শক্তিগুলোকে জয় করা। রাজনৈতিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র হলো এ মতবাদের দার্শনিক কেন্দ্রবিন্দু আর উদার গণতন্ত্র হলো এর প্রায়োগিক কাঠামো যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার অভিরুচি ও মতামতকে প্রকাশ করে। গোষ্ঠী ধারণাটা উদারবাদের দর্শনের আওতায় পড়ে না। অর্থনৈতিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি এবং আধুনিকায়ন হলো উদারপন্থী দর্শনের মূল বিষয়। সম্পদের ন্যায্য এবং সুষম বন্টনের চেয়ে বরং এর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই এ মতবাদে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে মার্কসবাদের প্রত্যাশা হলো শ্রেণীহীন বিশ্বসমাজ গঠন। এটা শ্রেণী সংগ্রাম (Class struggle)-কে স্বভাবজাত এবং অবশ্যম্ভাবী হিসেবে বেশি জোর দিয়ে থাকে। এ মতবাদ নৃ-গোষ্ঠীকে জাতি হিসেবে গ্রহণ করে এবং উদারবাদের লালিত বর্জুয়া গণতন্ত্রের বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। অর্থনৈতিক সফলতার বিচারে শোষণের অনুপস্থিতিটাকে এতে প্রধান মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ মতবাদে ব্যক্তি সুবিধার উপরে সামষ্টিক সুবিধাকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

অপরদিকে, ইসলামী মতবাদে এর বিশ্বাসীগণকে একটা একক বিশ্বসম্প্রদায় বা উম্মাহ হিসেবে গণ্য করা হয়। ইসলামী মতানুসারে গোত্র-বর্ণ-ভাষা ইত্যাকার বিভাজন দৈবায়ত্ত

তথা পরিচিতি সূত্র বৈ কিছু নয়। এ মতবাদে শূরা (পারস্পরিক পরামর্শ) হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য, তবে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হলো আল্লাহ, কোন রাজা, একনায়ক কিংবা এমনকি জনগণও নয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উম্মাহর স্বাধীনতাকে আল কুরআন এবং রাসূল (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) এর সুন্নাহ নির্গত কতকগুলি মূলনীতির দ্বারা পরিসীমিত করে দেয়া হয়েছে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারকে একটা মৌলিক মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা হয়। ইসলামী সমাজে ব্যক্তি এবং সমষ্টির মাঝে ভারসাম্যতা সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয়। এটা উদারবাদের মত শুধুমাত্র ব্যক্তিকে কিংবা মার্কসবাদের মত শুধুমাত্র সমষ্টিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না।

আলোচ্য মতবাদগুলোর প্রত্যেকটি সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে পরস্পর বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপন করে। কিছু মৌলিক ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিরাজ করে। এ সমস্ত বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার মধ্যে কোন সংলাপ কি আদৌ সম্ভব? আমাদের মতে, আমরা যদি ঐসব চিন্তাধারাকে এদের নিজস্ব গণ্ডি এবং এদের প্রবক্তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী অনুধাবন করতে চাই তাহলে একে অপরকে অধিকতর ভালোভাবে বুঝা সম্ভব হবে। একমাত্র ব্যাখ্যা-বিশেষিকরণের মাধ্যমেই আমরা এসব চিন্তাধারাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। যদিও পশ্চিমাদের একটা প্রবণতা আছে শুধুমাত্র তাদের চিন্তাধারাকেই একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক হিসাবে মনে করা এবং অন্যান্য চিন্তাধারাকে কেবলমাত্র প্রচারণা, ধর্মীয় কুসংস্কার ও সংস্কারবিরোধী পশ্চাদমুখীনতা হিসেবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। তথাপি বিভিন্ন ধারার মধ্যে একটা সত্যিকার এবং অর্থবহ সংলাপ সৃষ্টিতে অবদান রাখা সম্ভব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা এ গ্রন্থে উল্লেখিত ধারাত্রয়ের নিজ নিজ সাহিত্যকর্ম, বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীর চিন্তাবিদ ও লেখকদের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা করব। এতদসংক্রান্ত সব সাহিত্যকর্মকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে : (ক) সনাতন ধারার তত্ত্ব (খ) আধুনিকায়ন তত্ত্ব এবং (হ) উত্তরাধুনিক তত্ত্ব।

শুধুমাত্র তিনটা চিন্তাধারার প্রতি আমরা বিশেষভাবে মনোযোগ দিচ্ছি তার অর্থ এ নয় যে, আমরা অন্যান্য মতবাদের অস্তিত্বকে কিংবা তাদের গুরুত্বকে অস্বীকার করি। বরং এটা এ জন্যই যে, গ্রন্থকারের শিক্ষায়তনিক অনুরাগ এবং ব্যাপক অর্থে অত্র তিনটা ধারার মধ্যে তার বিশেষজ্ঞতার পরিসীমার কারণে। ঠিক এমনিভাবেই অন্যান্য নানাবিধ চিন্ত াধারা যেমন হিন্দু, কনফুসিয়ান, সিনতো এবং নানান আফ্রিকান ও ল্যাটিন আমেরিকান মতবাদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীগুলোও পর্যবেক্ষণ করতে পারি। যাই হোক, তবে সুনির্দিষ্ট চিন্ত া-কাঠামোর অভাব কিংবা উপলব্ধির অগভীরতার সংকোচের কারণে এমন উচ্চাভিলাষী গবেষণা কর্ম এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি ☐

প্রথম অধ্যায়

উদারতাবাদ

পশ্চিমা উদারপন্থী মতবাদ জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রশ্নে উভয় সংকটের সম্মুখীন হয়েছে এবং জাতি-রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক ফরমূলায় এতদউভয়ের মধ্যেকার মৌলিক দ্বন্দ্বকে আন্তর্জাতিকতাবাদের পক্ষে মীমাংসা করতে সচেষ্ট হয়েছে। জাতীয়তাবাদকে প্রাকৃতিক ও স্ব-উদ্ভাবিত মতবাদ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং ধরা হয়েছে যে গোটা বিশ্ব যৌথ প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে সীমিত জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মাঝামাঝি কোন মধ্যপন্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যকার উভয় সংকটটা ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য আমরা চারজন ঐতিহ্যবাদী/ মূলধারার চিন্তাবিদের চিন্তাচেতনা প্রথমে পর্যালোচনা করব। তাঁরা হলেন (১) আর্নল্ড জে টোয়েনবী (২) ই এইচ কার (৩) হান্স কোন এবং (৪) কার্লটন হেইস। তাঁদের মতামতের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে তাদের মধ্যকার সামঞ্জস্যতাগুলো নির্ধারণ করব।

ঐতিহ্যবাদী চিন্তাবিদগণ

আর্নল্ড জে টোয়েনবী (A J Toynbee)

পাশ্চাত্য সর্বজনবাদের চিন্তাধারায় টোয়েনবী সত্যিকার অর্থেই একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী। তিনি জাতিরাষ্ট্রের ধারণাকে বিশ্লেষণের একটা অপূর্ণাঙ্গ মাপকাঠি বিবেচনা করে পরিত্যাগ করেছেন এবং পরিবর্তে সভ্যতাকে গবেষণানুসন্ধানের যথাযথ বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি 'বিশ্বের একত্বতা' (Unity of the World) তত্ত্বকেও 'ভ্রষ্টধারণা' হিসেবে গণ্য করেছেন যেটার প্রতি পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদেরা তাঁদের আর্থসামাজিক পরিবেশের প্রভাবে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি সুগভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, "ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেককারী বাস্তব সত্য হলো এ যে, আধুনিক যুগে আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা এর অর্থনৈতিক জাল সারাবিশ্বে বিস্তার করে ফেলেছে এবং এ অর্থনৈতিক একীভূতকরণের সমভিত্তির উপর নির্ভর করে একটা রাজনৈতিক একীভূতকরণ এমন একটা পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে ... যে সাম্প্রতিক বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রগুলো পশ্চিমা উদ্ভুদ একটা একক রাজনৈতিক পদ্ধতির অংশ হয়ে গিয়েছে। ... একদিকে যখন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মানচিত্র পাশ্চাত্যকরণ করা হয়েছে তখন অন্যদিকে সাংস্কৃতিক মানচিত্র মৌলিকভাবে পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিজয়ের পূর্বাবস্থাতেই অপরিবর্তিত রয়েছে।"[১]

টোয়েনবীর মতে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো অনৈক্য (Disintegration)। অনৈক্য শুরু হয় যখন একটা সৃজনশীল সংখ্যালঘুগোষ্ঠী তার সৃজনশীলতা হারায় এবং পেশীশক্তির উপর নির্ভর করতে শুরু করে। এভাবে তাদের

পরিবেষ্টনকারী অসৃজনশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ উদ্বেলিত গোষ্ঠী পরাজিত হয়। ভিতরের এবং বাইরের সাধারণ জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ অনৈক্যের প্রক্রিয়াকে আরো দ্রুততর করে। ভিতরগত ও সাধারণ জনগোষ্ঠী (Internal proletariates) বলতে তিনি বুঝিয়েছেন দশটা অনৈক্যের সভ্যতার জনগোষ্ঠী যাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে বিগত চারশ বছর ধরে পাশ্চাত্য ধারার অন্তর্ভূক্ত বলে ধরে নেয়া হয়েছে। বাইরের সাধারণ জনগোষ্ঠী (External proletariates) হলো সভ্যতার আওতা বহির্ভূত "অসভ্যজাতি" (Barbarians) গুলো, যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতির ফলে বাইরের সাধারণ জনগোষ্ঠী গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতায় অনৈক্যের অবধারিত ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতায় ভিতরগত সাধারণ জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহের একটা উদাহরণ হলো জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদ নামের মতবাদের উদ্ভব।

টোয়েনবীর মতে জাতীয়তাবাদ হলো একটা নেতিবাচক শক্তি যেটা সংকীর্ণ রাষ্ট্র ধারণার প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র এবং শিল্পায়নের প্রভাবে নবসামাজিক মুক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আঠারশ শতকের শিল্পায়নযুগ পূর্বে পশ্চিমা সমাজ অধিকতর আত্ম-সন্তুষ্ট ছিল কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পর্যদুস্ত করে ফেলেছে। তাঁর মতে পাশ্চাত্য সভ্যতায় জাতীয়তাবাদ-প্রবৃত্ত বিধ্বংসী যুদ্ধ-বিগ্রহ হলো একটা 'বেদনাময় যুগ (Time of Troubles)'। তাঁর মতে-

> খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ পশ্চিমা সমাজকে পরিস্কারভাবে কয়েকটা পূজনীয় মূর্তি উপহার দেয়া হলো; তবে এগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র একটা অন্য সবগুলোর উপর স্থান করে নিল-আর সেটা হলো সংকীর্ণ রাষ্ট্র নামক বস্তুর পূজা। ... বিশ্বজনীন চার্চের সুদৃঢ় প্রভাবকে অপসারণ করা হলো। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন মতাদর্শের দ্বারা সংমিশ্রিত জাতীয়তাবাদ উদ্ভুত গণতন্ত্র যুদ্ধ বিগ্রহকে অধিকতর অসহনীয় করে তুললো। উপরন্তু শিল্পবাদ এবং প্রযুক্তিগত উদ্দীপনা যুদ্ধরত জাতিগুলোকে উন্নততর বিধ্বংসী মারণাস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করলো।[২]

ইতিহাসের খণ্ড-বিখণ্ডতার আরেকটা লক্ষ্যণীয় প্রমাণ হলো যে, খণ্ড-বিখণ্ডতার সর্বশেষ পর্যায়ে একটা সভ্যতা শক্তিপ্রয়োগে রাজনৈতিক একত্রীকরণে বিশ্বাসী একটা বিশ্বজনীন রাষ্ট্রের কাছে নত হয়। টোয়েনবী এ প্রসঙ্গে বিশ্ব একীভূতকরণে ফ্যাসিবাদ ও হিটলারের উত্থানকে স্মরণ করেন। তাঁর মতে সাম্যবাদ (Communism) হলো পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য একটা অন্তর্নিহিত হুমকি। তাঁর মতে–

> ... এমনকি কোন একদিন যদি বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদের সম্প্রসারণের মাধ্যমে রুশ সাম্যবাদীদের আশা পূরণও হয়, তবুও বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী বিজয়কে একটা বহিঃসংস্কৃতির বিজয় হিসেবে ধরে নেয়া যাবে না। কারণ ইসলামের মত না হয়ে বরং সাম্যবাদ নিজেই

> পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে উদ্ভূত একটা মতবাদ যেটা প্রতিক্রিয়া ও সমালোচনার রূপ নিয়ে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।[৩]

টোয়েনবী 'বিশ্বজনীন ধর্ম' সমজ্ঞান থেকে সাম্যবাদের (Communism) বিভিন্নমুখী জাতিরাষ্ট্রের বিবর্তনে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহন সত্ত্বেও অন্যান্য সভ্যতার ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতি এখনও জীবিত আছে।

> বেঁচে থাকার সংগ্রামে পশ্চিমা বিশ্ব তার সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বীগুলোকে কোনঠাসা করে দিয়েছে এবং এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্থানে তাদেরকে শৃঙ্খলিত করে ফেলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা তাদেরকে তাদের বিশিষ্ট সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। যদিও তারা প্রচণ্ড চাপের মুখে আছে, তবুও তারা এখনো তাদের আত্মাকে নিজস্ব বলে দাবি করতে পারে।[৪]

টোয়েনবী বিশেষ করে ভবিষ্যতে ইসলামী পুনর্জাগরণের সম্ভাবনার আশাবাদ ব্যক্ত করেন :

> ইসলামী সমাজের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, আমরা সম্ভবতঃ প্যান-ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে একটা বিশ্বজনীন রাষ্ট্রীয় মতবাদের অংকুরোদগমের আশা করতে পারি।[৫]

টোয়েনবী পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদগণকে তিনটা ভ্রান্ত মতের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন : (১) আত্ম-কেন্দ্রীকতা (২) প্রাচ্যের অপরিবর্তন সম্পর্কীয় দিবাস্বপ্ন এবং (৩) উন্নতির গতির সমান্তরাল রেখা সম্পর্কিত মোহ।

ই এইচ কার (E H Carr)

ই এইচ কার মনে করেন যে, আন্তর্জাতিকতাবাদ যেমন বিশ্ব পর্যায়ে প্রভূত্বশীল জাতিগুলোর মূলমন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রভূত্বশীল নৃ-গোষ্ঠীর মূল আদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদকে গণ্য করা হয়েছে।[৬] তিনি মনে করেন যে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে সমগোত্রীয়তার মনোভাব অতি সহজেই সাম্রাজ্যবাদে রূপ নিতে পারে যদি নেতৃত্বদানকারী গোষ্ঠী মূল্যবোধের দৃষ্টিশক্তি হারায় এবং পরিবর্তে কেবলমাত্র পেশী শক্তির উপর নির্ভর করে।

কার জাতীয়তাবাদের আধুনিক বিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের উপর এর প্রভাবের ব্যাপারে নিম্নোল্লিখিত তিনটা সময়কালকে নির্ধারণ করেছেন।[৭]

তাঁর মতে, প্রথম যুগ হলো প্রাক-ফরাসী বিপ্লব যুগ (১৭৮৯)। এ যুগে জাতিগুলো তাদের সর্বক্ষম রাজাদের পরিচয়ে পরিচিত হতো। সেজন্য এ যুগের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ছিল মূলতঃ সার্বভৌম রাজাদের মধ্যকার সম্পর্ক। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের জন্ম এ সময়েই। সেযুগে এটাই ছিল সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিক যুগ, কারণ "সাধারণ জনগণ

নির্দ্বিধায় তখনও একে অপরের রাজ্যে যাওয়া আসা এবং একে অপরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারতো যখন তাদের সার্বভৌম রাজারা যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো।" অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র এবং অভিজাততন্ত্রের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা।

কার এর মতে জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের দ্বিতীয় যুগটা ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) থেকে শুরু করে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ে 'জাতি' বলতে দেশের 'মধ্যবিত্ত' সমাজকে ধরে নেয়া হতো, আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কটা জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যকার সূক্ষ্ম ভারসাম্য দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। দুটো কারণে জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য বিধ্বংসী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি : (১) নিম্নশ্রেণী থেকে উদ্ভুত বিপ্লবের আশঙ্কায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী সর্বদা সংঘবদ্ধ থাকতো এবং (২) বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের বিস্তারের কারণে বৃটিশ নেতৃত্বের অধীনে মুক্ত অর্থনীতি (Laissez-faire) সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে রূপ লাভ করেছিল।

১৯১৪ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত বিস্তৃত জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের তৃতীয় যুগটা জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক অগ্রগতি এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের অন্তঃসারশূণ্যতা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কার (Carr) এর মতে জাতীয়তাবাদের অগ্রগতির তিনটা কারণ ছিল ঃ (১) সমাজের নব্য শ্রেণীর কার্যকর জাতিসত্ত্বায় পরিগণিত হওয়া (২) বহুমুখী জাতীয় অর্থনীতি একক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থান দখল করে নেয়া এবং (৩) জাতি রাষ্ট্রের সংখ্যার প্রবৃদ্ধি। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সমকালীণ সংকটের মূল বিষয় ছিল জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদীদের শক্তিসমূহের মধ্যকার পরস্পর বুঝাপড়ার অভাব। যতটুকু অস্বস্তিকর ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাও ১৯১৪ সালে ভেঙে পড়েছিল।

তবে দুটো কারণে সমসাময়িক যুগে আন্তর্জাতিকতাবাদের ভবিষ্যত বিষয়ে কার (Carr) সতর্ক আশাবাদ পোষণ করেন : (১) দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের দুঃসহ ভয়াবহতা এবং (২) যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার বহুজাতিক বৈশিষ্ট্য।

হানস কোন (Hans Khon)

উপরোল্লিখিত দুই বিশেষজ্ঞ জাতীয়তাবাদ বিষয়টাকে আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের বিপরীতে হানস কোন (Hans Khon) এবং কার্লটন হেইস (Carleton Hayes) প্রথমে জাতীয়তাবাদ এবং পরে আন্তর্জাতিকতাবাদকে বিবেচনায় নেয়ার পক্ষপাতী। এ দুই বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মতামত জাতীয়তাবাদ বিষয়ে পরবর্তী লেখক গবেষকগণের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

হানস কোন, যাকে বলা হয় "উদার বুদ্ধিবৃত্তি ও বিশ্ব সমাজের মহাপুরুষ" (A prophet of liberal rationalism and world community), হলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী লেখক যিনি উদারপন্থী মতধারায় সমসাময়িক কালের অধিকাংশ জাতীয়তাবাদ বিশেষজ্ঞদের চিন্তা-চেতনার গঠনে ভূমিকা রেখেছিলেন।[৮] তাঁর উদ্ভাবিত শ্রেণী বিভক্তিগুলো বর্তমান যুগের জাতীয়তাবাদ বিষয়ক উদারপন্থী লেখকগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

বিচার না করেই প্রয়োগ করেন। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদ হলো "একটা মনঃস্তাত্ত্বিক অবস্থা যেটা একটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তঃকরণে অবস্থান করে এবং প্রতিটা নাগরিকের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হওয়ার দাবি করে; এটা মনে করে যে, জাতিরাষ্ট্র হলো আদর্শ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয়তা হলো সকল সৃজনশীল শক্তি ও অর্থনৈতিক কল্যাণের উৎস।"[৯]

হানস কোন-এর প্রধান যুক্তি তাঁর সমস্ত লেখাগুলোতে প্রতিভাত হয়েছে সেটা হলো বুদ্ধিবৃত্তিজাত (Enlightened) জাতীয়তাবাদ এবং উদারপন্থাবাদ একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং এ ধরনের জাতীয়তাবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বিশ্ব ঐক্যতার পৃষ্ঠপোষক হতে পারে। কোন (Kohn) তাঁর প্রথম দিককার লেখাগুলোতে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ এবং রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন। তিনি মনে করতেন যে, সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ হলো একটা প্রগতিশীল শক্তি এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রশমনে সর্বোত্তম মাধ্যম বলে বিবেচিত হতে পারে। রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, এটা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজে শৃঙ্খলা আনয়নের একটা মূলনীতি, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এটার কার্যকারীতা অবশিষ্ট ছিল না। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের স্থান দখল করে নেবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদের শ্রীবৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে এর গণজাগরণী ভূমিকা মানবজাতির সকল সভ্যতার মধ্যে নিবিড় সাংস্কৃতিক বন্ধনের দ্বার উন্মোচন করেছে। জাতীয়তাবাদ একই সঙ্গে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে আবার একত্রও করে। তাঁর কথায় ঃ

> সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, সংকোচনশীল এ বিশ্বে সকল জাতির ক্রম আন্তনির্ভরতার মধ্য দিয়ে, শিক্ষার নতুন দিক নির্দেশনার মধ্য দিয়ে, অতিজাতীয় সমভাবাপন্ন মনোস্কামনা ও সহমর্মিতাকে অন্তর্ভূক্ত করার পরিধি আরো ব্যাপকতা লাভ করতে পারে।[১০]

তিনি মানবজাতি ও সমাজের একটা চূড়ান্ত ঐক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে ঐক্য সাংস্কৃতিকভাবে বহুধা বিভক্ত মানবজাতিকে সোজাভাবেই সংঘবদ্ধ করবে।

কোন্-এর মতে সাম্রাজ্যবাদটা ছিল ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ ও এশীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যকার একটা মধ্যবর্তী সেতুবন্ধন। জাতীয়তাবাদ ইউরোপীয় জাতিগুলোকে রাজনৈতিক রাষ্ট্রের কাঠামোতে সংঘবদ্ধ করেছিল এবং অতঃপর বিজাতীয় জনগোষ্ঠীর উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে তার মহত্ব প্রমাণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এ সাম্রাজ্যবাদ পরবর্তীতে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর ভিতরে জাতীয়তাবাদের আগুন প্রজ্বলিত করেছিল।

কোন্ (Kohn) এর প্রথম দিককার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের বিভাজন তাঁর পরবর্তী সাহিত্যকর্মে সু-রাজনৈতিক ও কু-রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদে রূপ লাভ

করেছে। সু-রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ যেটা বৃটেন, ডাচ এবং ফ্রান্সে উন্নতিলাভ করেছিল সেটা ব্যক্তি-স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার এবং আন্তর্জাতিকতাবাদকে গুরুত্ব দিয়েছিল। অন্যদিকে কু-রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ যেটা পূর্ব ইউরোপে উন্নতিলাভ করেছিল সেটা ছিল সংকীর্ণমনা, গোষ্ঠীবাদ ও পক্ষপাতদুষ্ট। তিনি পশ্চিমা ও প্রাচ্য জাতীয়তাবাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো নিরূপণ করেছেন তা নিম্নে সারণীতে উল্লেখ করা হলো।

কোন্ (Kohn) ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ, প্যান-স্লাভজাতীয়তাবাদ ও আন্তঃ এশীয়বাদকে সমভাবে নিন্দা করেছেন কারণ এগুলো পাশ্চাত্য উদার মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রথমদিককার রচনাবলীতে কোন (Kohn) সোভিয়েত ইউনিয়নের অতি-জাতীয় নীতিকে পশ্চিমা জ্ঞানালোকে প্রাপ্ত চেতনার (Enlightened) সত্যিকার মূল্যবোধের রূপায়ন বলে প্রশংসা করেছেন কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপারে মারাত্মক সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণ করেন।

কার্লটন হেইস (Carleton Hayes)

কার্লটন হেইস দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। দেশাত্মবোধ হলো একটা প্রকৃতিগত বোধক্রিয়া কিন্তু জাতীয়তাবাদ হলো একটা কৃত্রিম সৃষ্টি। জাতীয়তাবাদ মতাদর্শ প্রাথমিকভাবে পশ্চিম ইউরোপকে পদদলিত করেছিল এবং পরবর্তীতে ক্রমবর্ধিষ্ণু বিশ্ববাজারে একটা প্রধানতম ইউরোপীয় রপ্তানীদ্রব্যরূপে বিস্তার লাভ করে। তিনি জাতীয়তাবাদকে নিম্নলিখিতভাবে সংঙ্গায়িত করেছেন :

> "জাতীয়তার সাংস্কৃতিক ভিত্তি হলো একই ভাষা এবং একই ঐতিহাসিক ঐতিহ্য। যখন এগুলো কোন শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে গণ আবেগ তাড়িত দেশাত্মবোধের লক্ষ্যবস্তুতে পরিগণিত হয় তখনই জন্ম নেয় জাতীয়তাবাদের।"[১২]

জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব কেন ইউরোপে হলো? হেইসের মতে এর তিনটা কারণ রয়েছে ঃ প্রথমতঃ ইউরোপের ধর্মশূণ্যতা যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদ ধর্মের বিকল্প কিংবা এটাই একটা "ধর্ম" হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো। তিনি বলেন :

> ... এটা একটা অবধারিত সত্য যে, আলোকপ্রাপ্ত (Enlightenment) যুগ মানুষের ভিতরে খৃষ্টবাদের ব্যাপারে সংশয়ের উদ্রেককে প্রত্যক্ষ করেছে সেটা আবার ধর্মনিরপেক্ষ, বিশেষ করে জাতীয় রাষ্ট্রে আরেকটা বিকল্প প্রকৃত পবিত্রময়, সত্ত্বার উন্মেষকেও প্রত্যক্ষ করলো।"[১৩]

দ্বিতীয়ত: শিল্পবিপ্লব ও গণতন্ত্রের প্রভাবে যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল সেটা জাতীয়তাবাদের উত্থানের পথকে সুগম করেছিল। হেইস বিশেষভাবে দুটো পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন : (১) গণমানুষের অবস্থানিক পরিবর্তন, এবং (২) জাতীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ ও দিক নির্দেশনায় ক্ষমতাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণী জাতীয়তাবাদ নামক আদর্শকে লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

তৃতীয়তঃ জাতীয়তাবাদ সামাজিকীকরণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রেরণাও লাভ করেছিল যেগুলো অপ-বৈজ্ঞানিক পোষাকের আড়ালে জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধের অপপ্রচার করতো এবং নতুন নতুন প্রতীককে ঘিরে মানুষকে শিক্ষা দিত।

হেইস খুব মনোমুগ্ধকর ও বিস্তারিতভাবে খুঁজে দেখেছেন কিভাবে একটা সত্যিকার নির্ভেজাল নীতিদর্শন (মানবিক জাতীয়তাবাদ) যার মূল ভিত্তি ছিল স্বাধীনতা, সাম্যতা ও ভ্রাতৃত্ব, এমন একটা উৎস থেকে উদ্ভুত জাতীয়তাবাদ বিবর্তনের মাধ্যমে ১৮৭৪ সাল হতে জাতীয় সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তর লাভ করলো।[১৪] তিনি জোর দিয়ে এ সত্যই প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, শেষ পর্যায়ে এসে জাতীয়তাবাদ দেশে এবং বিদেশে উভয় ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদে রূপ লাভ করেছিল। তিনি বলেন :

> ... ফরাসী বিপ্লবের পরে যদিও জাতীয়তার ভিত্তিতে ইউরোপীয় মানচিত্র নতুন করে আঁকতে এবং সমন্বিত জাতি-রাষ্ট্র সৃষ্টিতে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, তথাপি কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রই কোন একক জাতীয়তাকে গ্রহণ কিংবা একক জাতীয়তাতে সীমাবদ্ধ ছিল না ... জাতীয় স্বাধীকার আসলে উচ্চতর জাতি কর্তৃক নির্ধারণের বিষয় হয়ে গেল। জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র বহিঃবিশ্বেই না বরং ইউরোপের (এবং আমেরিকার) মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠলো।"[১৫]

মানবতাবাদ, জাকবীয়, ঐতিহ্যগত, উদার এবং অবিচ্ছেদ (Integral) এমন ধরনের জাতীয়তাবাদকে পর্যালোচনা করে হেইস বলেন যে, উল্লিখিত কোন জাতীয়তাবাদই (অবিচ্ছেদ জাতীয়তবাদ ব্যতীত) তত্ত্বগতভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধী ছিল না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এদের প্রত্যেকটাই ক্রমান্বয়ে এবং দুর্বোধ্য কারণে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হলো। তিনি জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

> ...আন্তর্জাতিক বৈরিতা এবং যুদ্ধ ক্রমান্বয়ে আরো পৌনঃপুনিক, নিত্য ও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে। ঠিক যেমন জাতীয়তাবাদ মানবিকতাবাদ থেকে বিবর্তিত হয়ে জাকবীয়, ঐতিহ্যগত এবং উদার স্তর পার হয়ে... অবিচ্ছেদ্য কাঠামোতে উপণীত হয়েছে।[১৬]

টোয়েনবী, কার এবং হেইস প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের নেতিবাচক ফলাফলকেই উল্লেখ করেছেন যেটা অবধারিতভাবে বিদ্বেষ, বৈরিতা ও যুদ্ধের দিকে ঠেল দেয়। তাঁরা সকলেই তাঁদের সভ্যতার বিশ্বজনীন মূল্যবোধ যেমন জাতি নির্বিশেষে স্বাধীনতা ও সামাজিক সুবিচার ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিকতাবাদকে সমর্থন করেছেন। যদিও দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রভূত্ব লাভ করবে বলে টোয়েনবী এবং কার আশাবাদ পোষণ করেন। হেইস তাঁদের সাথে একমত পোষণ করেন না। তাঁর মতে যতক্ষণ না সামাজিকীকরণ প্রতিষ্ঠানগুলো

আন্তর্জাতিকতাবাদের পক্ষে আত্ম নিবেদিত হবে, ততদিন জাতীয়তাবাদের নেতিবাচক শক্তিকে উপেক্ষা করা যায় না।

আলোচিত সকল বিশেষজ্ঞরাই জাতীয়তাবাদের সকল প্রকারভেদ একই মানদণ্ডে বিচার করেছেন। তাঁদের মতে মানবিকতাবাদ হতে জাতীয়তাবাদের ফ্যাসীবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী মূর্তিতে রূপান্তরিত হওয়াটা আসলে জাতীয়তাবাদ নামক নীতি-দর্শনের মধ্যে অন্তর্নিহিত গুণাবলীর যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। হেইসের মতে, এটা এক প্রকার থেকে আরেক প্রকারে রূপান্তরিত হওয়ার একটা সমান্তরাল ধারা।

কোন্ (Kohn) এর দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য ভিন্ন এবং জাতীয়তাবাদ বিষয়ে পরবর্তী চিন্তাবিদদের উপরে তাঁর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। আজীবন একজন একনিষ্ঠ উদার-জাতীয়তাবাদী কোন (Kohn) জাতীয়তাবাদ মতাদর্শের অন্তর্নিহিত ইতিবাচক গুণাবলীতে বিশ্বাস করতেন। তাঁর বিভাজিত রাজনৈতিক বনাম সাংস্কৃতিক, সু-জাতীয়তাবাদ বনাম কু-জাতীয়তাবাদ, উদার বনাম অনুদার নীতিমালা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং বাস্তবিকপক্ষে এগুলোই জাতীয়তাবাদ বিষয়ক পরবর্তী সাহিত্যকর্মে প্রাধান্য লাভ করেছে। বিশ্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ সত্ত্বেও কোন (Kohn) গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, আন্তর্জাতিকতাবাদে উত্তরণের পথ কেবলমাত্র উদার-জাতীয়তাবাদের মধ্যেই নিহিত আছে।

সারণী-২ : পশ্চিমা ও প্রাচ্য জাতীয়তাবাদ

ক্রম	পশ্চিমা জাতীয়তাবাদ	প্রাচ্য জাতীয়তাবাদ
১	শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী অধ্যুষিত এলাকার উদ্ভব।	দুর্বল মধ্যবিত্ত শ্রেণী অধ্যুষিত এলাকার উদ্ভব।
২	আঠারশ শতকের Enlightenment দর্শন নির্ভর; প্রগতির ভিত্তি হিসেবে বুদ্ধিবৃত্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেয়	Enlightenment এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া; আবেগবাদ, রোমান্টিকতা, গোষ্ঠীবাদ প্রগতির ভিত্তি।
৩	ভবিষ্যতনির্ভর, দূরদর্শী	ঐতিহ্য, বীরগাঁথা, অলৌকিক অতীত।
৪	স্বজাত সৃষ্ট	পশ্চিমা ধারা থেকে উদগত।
৫	রাষ্ট্র-ক্ষমতা সীমিতকরণে বিশ্বাসী	ক্ষমতাকে গৌরবান্বিতকরণে বিশ্বাসী।
৬	বিশ্বজনীন ঐক্যতা	জাতীয় ঐক্যতা।

Ken Wolf, "Hans Kohn's Liberal Nationalism", *Journal of the History of Ideas*, 4 (Oct.-Dec. 1996)

আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সাহিত্যকর্মে (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) মোটামুটিভাবে আন্তর্জাতিকতার স্বপক্ষে জাতীয়তাবাদকে উপেক্ষা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। নিচে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে তিনটা অংশে উদার আন্তর্জাতিকতাবাদ বিষয়ক সাহিত্য গবেষণার ধারা পর্যালোচনা করবো : (১) একীভূতকরণ মতবাদ (Integration), (২) আন্তঃনির্ভরশীলতা মতবাদ (Interdependence) এবং (৩) নীতি-আধিপত্যবাদ (Regimes)।

কার্ল ডয়েস (Karl W. Deutsch) এবং আর্নেষ্ট হ্যাস (Ernest B. Hass) নামক দু'জন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদের গবেষণাকর্ম ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে বৃহত্তর রাজনৈতিক গোষ্ঠী গঠনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।[১৭] ডয়েসের মতে রাজনৈতিক গোষ্ঠী হলো, "সামাজিক গোষ্ঠী যাদের মধ্যে রাজনৈতিক আদান-প্রদানের নিয়ম আছে, (আইন) প্রয়োগের কিছু মাধ্যম আছে, আর আছে (আইন) মেনে চলার সাধারণ অভ্যাস।" যেহেতু বৃহত্তর শক্তি প্রয়োগ ছাড়া ঐসব নিয়ম/অভ্যাস সর্বক্ষেত্রে নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটাতে সক্ষম নয়, তাই "নিরাপত্তা গোষ্ঠী"র উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশেষ মজার ব্যাপার ছিল যে, উত্তর আটলান্টিক এলাকায় "বহুধাবিভক্ত নিরাপত্তাগোষ্ঠী" নামক ঐতিহাসিক আবিস্কার যার সদস্যরা "বিভিন্ন সরকার ব্যবস্থা থেকে আইনগত স্বাধীনতা" উপভোগ করত। ডয়েস বিশ্বাস করতেন যে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া অবশেষে একদিন সারা পৃথিবীকে বিশ্ব একীভূতকরণে সাহায্য করবে। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন :

> আমাদের যুগের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পুরো উদ্যমটা যুদ্ধবিগ্রহ ও জাতিরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রাচীরকে ছাড়িয়ে যায়। মনে হচ্ছে এটা সীমিত আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় একটা বহুজাতিক বিশ্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটা হবে সীমিত তবে উত্তরোত্তর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক বহুজাতিক নিরাপত্তা সমাজ।[১৮]

হ্যাস একীভূতকরণ বলতে বুঝিয়েছেন 'একটা প্রক্রিয়া যেটার মাধ্যমে আলাদা আলাদা বিভিন্ন জাতীয় ব্যবস্থার রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে তাঁদের আনুগত্য, আশা-আকাঙ্খা এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডকে অন্য একটা বৃহত্তর কেন্দ্রাভিমুখী করতে প্ররোচিত করবে, যে কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠানগুলো ইতোপূর্বের জাতীয় রাষ্ট্রের উপর আইনগত কর্তৃত্বের অধিকারী হবে।'[১৯] ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর উদাহরণ টেনে তিনি বিশ্বাস করেন যে, প্রতিষ্ঠিত জাতি-রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে পশ্চাতবর্তী এবং একীভূতকরণ ইউরোপে এখন একটা 'ঐতিহাসিক সত্য।' তাঁর গবেষণার বৈশিষ্ট্য হলো বাস্তবধর্মী। তাঁর নিজের কথায় 'একীভূতকরণ সূচারুভাবে কাজে লাগানোর মূল চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে একীভূত করা যায় এমন বিষয়গুলোকে নির্বাচনের মধ্যে ... এবং অরাজনৈতিক এমন সব উদ্দেশ্যাবলীকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেগুলো অতিশীঘ্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে রূপ নিবে। ... নগরভিত্তিক বহুমুখী শিল্প-অর্থনৈতিক পরিবেশটা এর পক্ষে একটা মোক্ষম

উপায়, তবে একমাত্র নয়।' একীভূতকরণ বিষয়ক সকল বিশেষজ্ঞের মতামতকে এখানে পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়, তবে সারণী নং-৩ একীভূতকরণের কাঠামোগত দিকগুলোর একটা নমুনা পেশ করছে যেটা অধিকাংশ বিশেষজ্ঞগণের মতামতকে অন্তর্ভূক্ত করবে।

সারণী-৩ : একীভূতকরণের কাঠামোগত রূপ : ত্রিরূপ বৈশিষ্ট্য

ডয়েস এবং অন্যান্যরা (Deutsch, et al.) (১৯৫৭)	হ্যাস-সুমিটার (Hass-Schumiter) (১৯৬৪)	নাই (Nye) (১৯৭১)
সঙ্গতিপূর্ণ :		
১. মৌলিক মূল্যবোধগুলোর সামঞ্জস্যতা	সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের পারস্পরিক অনুপূরকতা	সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের মূল্যবোধের পারস্পরিক অনুপূরকতা
২. পারস্পরিক প্রতিবেদনশীল সঙ্গতিপূর্ণ, তবে ভিন্ন বিষয়ে অধিকতর জোর দেয় :	সরকারের খাপ খাওয়ানোর সামর্থ	সদস্য রাষ্ট্রের খাপ খাওয়ানো ও তাল মেলানোর সামর্থ
৩. সমাজের উচ্চ শ্রেণীর বিস্তারকরণ	মত ও পথের বহুত্বতা	মত ও পথের বহুত্বতা (আধুনিক নাগরিক সংঘ)
অসংগতিপূর্ণ ৪. প্রভাবশালী মৌলিক বিষয়গুলোর উন্নয়ন তিন বৈশিষ্ট্যের কোনটাই যেটার উপর জোর দেয় না	আকার-আকুতি ও ক্ষমতায় সাদৃশ্যতা	সদস্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমতা ---
৫. পারস্পরিক লেনদেনের ব্যাপকতা	পূর্ববর্তী লেনদেনের উচ্চহার	---
৬. ব্যক্তির অধিকতর স্থানান্তর ৭. সামাজিক যোগাযোগের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ৮. স্বাতন্ত্রপূর্ণ জীবন বিধান		---
৯. শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি		

Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Jr. "Intenational Interdependence and Integration" in F. I. Greenstein and N. W. Polsby, (eds.) *International Polities: Handbook of Political Science,* vol. 8. (Reading, MA: Addison-Wesley, 1975), p. 379.

সত্তরের দশকের প্রথম নাগাদ যখন ইউরোপীয় একীভূতকরণ একটা বাস্তব সম্ভাব্যতার দ্বারপ্রান্তে উপণীত হয়েছে তখন এটা লক্ষ্য করা গেল যে, যদিও অধিকাংশ আমেরিকান তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞদের নিকট কম্যুনিটি গঠনমুখী 'আন্তঃ নির্ভরশীলতা' (Interdependence) ধ্যান-ধারণার মৌলিক বিষয়ে রূপ নিয়েছে তবুও পশ্চিম

ইউরোপীয় বাজার অর্থনীতির অভিজ্ঞতাকে বিশ্বের অন্য কোথাও সাফল্যজনকভাবে প্রতিস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।[২০] হোবসীয় (Hobbes) বাস্তববাদী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সম্পূর্ণতাকে আক্রমণ করে কিয়োহেন (Keohane) এবং নাই (Nye) যুক্তি পেশ করেছেন যে, এমনকি পূর্ব পশ্চিম সংঘর্ষের সবচেয়ে তিক্ততম বছরগুলোতেও পশ্চিম ইউরোপের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কটা নজীরবিহীন সহযোগিতাপূর্ণ ছিল যেটা অতি দ্রুততার সঙ্গে যুদ্ধংদেহী কূটনৈতিক সহাবস্থানকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল যেটা ছিল সনাতন ধারার 'যুদ্ধময় অবস্থা' (State of war)।

অতি সম্প্রতি যখন আমেরিকার বিশ্ব আধিপত্যে অবক্ষয়ের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হচ্ছে, যদিও এর বিপরীতে কিছু লক্ষণও দৃশ্যমান, তখন নীতি-আধিপত্যবাদ (Regime) বিষয়ক গবেষণা বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আন্তর্জাতিক Regime বলতে বুঝানো হয় যে ঐগুলো "কিছু" মূলনীতি, নৈতিক মূল্যবোধ, নিয়ম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ক প্রক্রিয়া যেগুলোর উপর ভিত্তি করে কোন একটা বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষের আশা-আকাঙ্খার সংমিশ্রণ ঘটে" (Principles, norms, rules and decision making procedures around which actor-expectations converge in a given issue-area)।[২১] এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত যুক্তি এ যে, ক্ষমতার আধিপত্যশীল বিভাজন স্থিতিশীল মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দেয়, কারণ একটা আধিপত্যশীল রাষ্ট্র তার নিজের স্বার্থে এমন নীতির অনুসরণ করে এবং একটা আধিপত্যশীল ব্যবস্থার সামর্থ আছে এমন একটা ব্যবস্থার সুচারু কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সামষ্টিক বিষয়ের যোগান সরবরাহ করায়।[২২] বহুবাচক মতবাদ, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, মুক্ত অর্থনীতি গভীর অনুসন্ধানের নিমিত্তে প্রায় নষ্টালজিয়ার বশবর্তী হয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটা দুর্বলতম ধরনকে গ্রহণ করেছে। আর সেটা হলো Regime (নীতি-আধিপত্যবাদ)

নীতিআধিপত্যবাদ বিষয়ক গবেষণা কর্মে তিনটা মৌলিক দুর্বলতা রয়েছে। একীভূতকরণের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও একীভূতকরণের বিপক্ষে ক্রিয়াশীল ব্যাপারগুলোর প্রতি সামান্য কিংবা একদমই নজর দেয়া হয়নি। K. J. Holsti এর জ্ঞানগর্ভ সমালোচনায় লিখেছেন-

> ... ক্রমবর্ধনশীল আন্তঃসম্পৃক্ততার বিষয়টা সন্দেহাতীতভাবে সঠিক। তবে এর ফলাফল সমস্যাবৃত্তই রয়ে গেছে। ক্রমবর্ধনশীল আন্তঃলেনদেন নির্ভরশীলতা, শোষণ, সংঘর্ষ এবং যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ঠিক যেমন একটা অধিকতর সহযোগিতা এবং পারস্পরিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে...
>
> জাতীয়তাবাদী নীতি, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি সংঘটিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে ঠিক এমন পরিস্থিতিতে যেটাতে থাকে স্পর্শকাতর এবং ভঙ্গুর ব্যাপারগুলোতে অসম ধরন, অসম আন্তঃলেনদেন, একমুখী প্রবাহ এবং শক্তিশালী

> পক্ষকর্তৃক দুর্বল পক্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আধিপত্য বিস্তারকরণের প্রচেষ্টা।[২৩]

এ ধরনের গবেষণাকর্মের প্রাথমিক বিষয় হলো পাশ্চাত্য বিশ্ব। বিশ্বজনীনতার ঢং থাকা সত্ত্বেও এর মৌলিক ধ্যান-ধারণা নৃ-কেন্দ্রিক (Ethno-centric)। এর মৌল ধারণা এবং পদ্ধতিগত পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে এটা সমাজতান্ত্রিক কিংবা উন্নয়নশীল দেশগুলোর একীভূতকরণ অথবা বিখণ্ডতার অভিজ্ঞতাকে গণনার ভিতরে আনেনা।

পরিশেষে, খোদ জাতীয়তাবাদের প্রতি যৎসামান্য কিংবা একেবারেই মনোযোগ দেয়া হয়নি। এটা ধরে নেয়া হয়েছে যে, জাতিরাষ্ট্র একটা অবধারিত বিষয়, একটা অসমস্যামূলক অস্তিত্ব। তথাপি, আন্তর্জাতিকতাবাদের মুক্ত (Liberal) আবরণ খসে পড়তে শুরু করলো যখন বিশ্বের সর্বত্রই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দ্বারা খোদ জাতিরাষ্ট্রই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো।

যাই হোক, অন্ততঃ দুইজন বিশেষজ্ঞকে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে জাতীয়তাবাদ বিষয়ে তাঁদের অবদানের জন্য। তাঁরা হলেন কে ডাব্লিউ ডয়েস (K. W. Deutsch) এবং আর্নেষ্ট গ্যালনার (Ernest Gellner)।

কে ডব্লিউ ডয়েস (K. W. Deutsch)

কার্ল ডয়েস মনে করেন যে, সমাজ এবং গোষ্ঠী (Community) উভয়েরই উৎপত্তি সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে। তবে গোষ্ঠী ঐ সকল মানুষের দ্বারা গঠিত হয় যারা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান রপ্ত করেছে এবং যাদের মধ্যকার পারস্পরিক সমঝোতা প্রাত্যাহিক লেনদেনকেও ছাড়িয়ে যায়। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদ হলো-

> আজকের যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামে জাতীয়তাবাদ হলো মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর বিশালসংখ্যক মানুষের একাত্মতা যারা আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত; এবং সামাজিক শ্রেণীসমূহকে সামাজিক যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে (শাখা-উপশাখামূলক) যোগসন্ধি এবং প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে।[২৪]

ডয়েস যুক্তি পেশ করেন যে, আধুনিকায়ন ও জাতীয়তাবাদ একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জাতীয়তাবাদ বিষয়ক তাঁর ধারণার মূলে রয়েছে সামাজিক আন্দোলন (Social Mobilization)। সামাজিক আন্দোলন হলো একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পুরাতন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনঃস্তাত্ত্বিক দৃঢ়বদ্ধতাগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অথবা ভেঙে পড়ে এবং জনগণ নতুন ধাঁচের সামাজিকতা গ্রহণ করতে তৈরি হয়ে যায়। সেজন্য, জাতীয়তাবাদ ব্যক্তির আবেগপ্রবণ প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণ করে, যদিও সেই ব্যক্তি সামরিকতাবাদ বা আরেকটা মতাদর্শকে বেছে নেয় ঠিক একই উদ্দেশ্য পূরণ করার

মানসে।[২৫] তাঁর মতবাদের মূলকথা হলো একীভূতকরণ, যদিও তিনি সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতাবাদকেও স্বীকার করেন। তাঁর কথায়–

> যদি (সামাজিক) সংমিশ্রণ আন্দোলনের আগেই সংঘটিত হয় অথবা একে অপরের সম্পূরক হিসেবে কাজ করে তবে সরকার ব্যবস্থা স্থিতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং পরিশেষে প্রত্যেকে একটা একক সত্ত্বায় একীভূত হবে ...
>
> যখন সামাজিক আন্দোলন (সামাজিক) সংমিশ্রণ থেকে দ্রুততর হয় তখন এর ফল হয় বিপরীত। উচ্চমাত্রার আত্ম-নিয়োগকারী ও বিতৃষ্ণ জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রের রাজনীতি ও সংস্কৃতি থেকে দূরে ঠেলে রাখা হয়, যার ফলে তারা সহজেই সরকার, রাষ্ট্র এমনকি তাদের দেশ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।[২৬]

যাই হোক, ডয়েস - এর মতামত তীক্ষ্ণ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। এ ব্যাপারে আমরা পরে আলোচনা করব।

আর্নেস্ট গ্যালনার (Ernest Gellner)

গ্যালনার জাতীয়তাবাদকে প্রাথমিকভাবে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে "এটা একটা রাজনৈতিক নীতি যেটা বিশ্বাস করে যে, রাজনৈতিক এবং জাতীয় সত্ত্বা অবশ্যই সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।" "জাতীয় আবেগ হলো নীতি ভঙ্গের দ্বারা প্রজ্বলিত উষ্মার অনুভূতি অথবা নীতির বাস্তবায়ন হেতু আত্মতুষ্টির অনুভূতি।" "জাতি" বলতে তিনি বুঝিয়েছেন-

১. দুইজন ব্যক্তির জাতীয়তা একই হয় যদি এবং শুধুমাত্র যদি তারা একই সংস্কৃতির হয়। সংস্কৃতির মানে হলো-মতাদর্শ, সংকেত-নিদর্শন এবং সংঘবদ্ধতার তথা আচার-আচরণ ও ভাবের আদান-প্রদানের একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম।
২. দুইজন ব্যক্তির জাতীয়তা একই হয় যদি এবং শুধুমাত্র যদি তারা একে অপরকে একই জাতির অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করে।[২৭]

তাঁর মতে মানবজাতি তিনটা স্তর পার হয়ে এসেছে : (১) কৃষিপূর্ব (২) কৃষি নির্ভর এবং (৩) শৈল্পিক যুগ। কৃষিনির্ভর যুগে কোন একক প্রভূত্বশীল সাংস্কৃতিক পরিচিতি ছিল না। সাংস্কৃতিক পরিসীমার আলোকে এ যুগের সবকিছুই রাজনৈতিক সত্ত্বার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। এ যুগে রাজনৈতিক সত্ত্বাগুলো দুভাগে বিভক্ত ছিলঃ স্ব-শাসিত স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং বিশাল সাম্রাজ্য। জাতীয়তাবাদ হলো তৃতীয় স্তর বা শৈল্পিক যুগের সৃষ্টি। এটা এ যুগের শ্রম-বিভাজনমূলক বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে উৎপত্তি হয়েছে। শিল্পায়ন একটা গতিশীল এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমজাতীয় সমাজের জন্ম দেয়। এটা হলো সমজাতীয়তার বিশ্বজনীন তাড়না যেটা জাতীয়তাবাদের ভিতরে প্রতিফলিত হয়েছে।

শিল্পভিত্তিক সমাজে সম-অধিকারের প্রত্যাশাও ছিল যেটা সাধারণতঃ ইতোপূর্বের স্থিতিশীল, শ্রেণীভিত্তিক, রক্ষণশীল ও একচেটিয়া কৃষিভিত্তিক সমাজে ছিল না। একই সময়ে শিল্পভিত্তিক সমাজের প্রাথমিক যুগে এটা তীব্র বেদনাময় এবং প্রত্যক্ষ সামাজিক অসমতার সৃষ্টি করেছিল, কারণ প্রাথমিক যুগের শিল্পবাদ মানেই হলো-জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, দ্রুত নগরায়ন, শ্রমের স্থানান্তর এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি ও রাজনৈতিক কেন্দ্রীয়করণ দ্বারা তৎকালীন কমবেশি আত্ম-কেন্দ্রিক গোষ্ঠীগুলোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করা। সেই যুগে যারা স্বল্প সুবিধাভোগীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল তাদের অবস্থা ছিল মারাত্মকভাবে শোচনীয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে চাপা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব তীব্র থাকে এবং এ দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে রূপ নেয় যদি শুভ লক্ষণকে পুঁজি করতে পারে। বৈশিষ্ট্যগতভাবে এটা ভাষা, বংশগতভাবে প্রবাহিত গুণাবলী (জাতি-বর্ণ-বিদ্বেষ) অথবা শুধুমাত্র সংস্কৃতিকেই পুঁজি করতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় ইতোপূর্বেকার সংস্কৃতির কিছু অংশ ব্যবহার করা হয় পরিবর্তিত ধাঁচে। গ্যালনার এ প্রক্রিয়াটা বিশ্ব পর্যায়ে অবলোকন করেনঃ

> যখন আধুনিকায়নের ঢেউ বিশ্বব্যাপী প্রবাহিত হয় তখন এটা সুনিশ্চিত করে প্রত্যেকেই কোন এক পর্যায়ে অনুভব করে যে সে অন্যায় আচরণের ভুক্তভোগী এবং সে এ ব্যাপারে তার ভিন্ন জাতিসত্তা হওয়াকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে। যদি সে যথেষ্ট সংখ্যক ভূক্তভোগীকে একই জাতিভূক্ত হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হয় তখনই জন্ম নেয় জাতীয়তাবাদের। যদি এ জাতীয়তাবাদ সাফল্য লাভ করে, অবশ্য সবগুলো করে না, তখন জন্ম হয় একটা জাতির।[২৮]

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গ্যালনারের মতামত হলো যে, এটা নির্ভর করবে অপেক্ষাকৃত অতীব্র ধাঁচের জাতীয়তাবাদ ও অংশীদারীত্বমূলক আন্তর্জাতিকতাবাদের উপর।

ডয়েস এবং গ্যালনারের যুক্তির ভিতর অনেক সাজুয্য রয়েছে। যেমন-মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আধুনিকায়ন, গণ-বিচ্যুতি ও (জাতীয়) পরিচিতির প্রয়োজনীয়তা, যোগাযোগের গুরুত্ব এবং উপসংহারের মোটামুটি সামঞ্জস্যতা। তবে গ্যালনার গুরুত্বারোপ করেন আধুনিকায়নের দস্তুর প্রক্রিয়া এবং শিল্পভিত্তিক আধুনিকতার পথে বিভিন্ন সম্ভাব্য বিবর্তনের উপর। ডয়েস যেখানে ভাষার উপর খুব বেশি জোর দিয়েছেন, সেখানে গ্যালনার অন্যান্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতীকের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ধর্মীয় প্রতীক বিষয়ে তাঁর মতামত অন্য যে কোন আধুনিকায়ন বিশেষজ্ঞদের থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা। যেমন তিনি মনে করেন ইসলাম একটা "শিক্ষা-নির্ভর মতধারা" (Literacy Sustained Tradition) এবং ইসলামের অন্তঃর্নিহিত নমনীয়তা আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ায় এর গুণগত যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে,

> আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটেও ইসলাম তার ধর্মীয় ভৌত বিশ্বাস ধারণে সক্ষম, সমান বিশ্বাসে বিশ্বাসী একটা অজ্ঞাত গোষ্ঠীর উপর প্রভূত্বশীল ধর্ম হিসাবে আবার মাথাঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে।[২৯]

উত্তর আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ

১৯৭০ দশকের প্রথমভাগে আধুনিকায়ন চিন্তাধারা সাধারণতঃ দুই দিক থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। নির্ভরশীলতাবাদ (Dependencia), যেটা মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, নব্য উপনিবেশবাদের জন্ম দিল এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে লাগলো যে, পর্যালোচনার সঠিক একক হিসেবে জাতি-রাষ্ট্র অসম্পূর্ণ। এ বিশ্বাস উদারপন্থী মতবাদের ভিত্তিকে প্রশ্নের সম্মুখীন করলো।

দ্বিতীয় আঘাতটা এসেছিল উদারপন্থা মতধারার অভ্যন্তর থেকেই। এ আঘাতের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ওয়াকার কোনার (Walker Conner) World Politics নামক গবেষণা পত্রিকায় তাঁর নিবন্ধ *Nation Building or Nation Destroying* প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। এ নিবন্ধে তিনি বিশ্বব্যাপী নৃ-জাতীয়তাবাদের (Ethno-nationalism) উত্থানকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন।[৩০] উইলিয়াম জে ফলস (William J. Foltz) তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্যে বলেনঃ

> পর্যালোচনার একক হিসেবে জাতি-রাষ্ট্র উপর-নিচ উভয় দিক থেকেই আক্রান্ত হয়েছে। উপরদিক থেকে যেমন 'নির্ভরশীলতা মতবাদ' ও কাঠামোগত সাম্রাজ্যবাদ-মতধারা অসংখ্য লেখার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছে, এবং মাঝে মাঝে কৃতকার্যও হয়েছে, যে কার্যকর 'কেন্দ্র' আসলে একটা গরীব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত নয়, বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে অবস্থিত শক্তি ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। ... নিচের দিক থেকে আক্রমণটা ব্যাপকতায় কম কিন্তু সমানভাবে মারাত্মক। এ মতধারা আসলে উপ-জাতীয় এককগুলোকে মূল রাজনৈতিক সত্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং জাতীয় রাজনীতিকে বিজিত শ্রেণীর উপর বিজয়ী শ্রেণীর আধিপত্যতার সংগ্রাম থেকে সামান্য উচ্চ পর্যায়ে পর্যালোচনা করে।[৩১]

যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো জাতীয়তাবাদ, তাই এখানে নিচ দিক থেকে আক্রমনের বিষয়টা আমাদের কাছে গুরুত্বপুর্ণ। এ সম্পর্কিত দু'জন বিশেষজ্ঞের মতামতকে আমরা এখানে আলোচনা করব। তাঁরা হলেন ঃ ওয়াকার কোনর (Walker Conner) ও এ ডি স্মিথ (A. D. Smith)।

কোনর (Conner)

কোনর (Conner) ডয়েস এর একীভূতকরণ প্রচেষ্টার এবং বিচ্ছিন্নতার প্রবণতার অগ্রাহ্যকরণের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে–

> একদিকে ডয়েস মনে করেন যে, সংস্কৃতিগতভাবে ভিন্ন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান যোগাযোগ প্রতিহিংসার জন্ম দিতে পারে। আবার অন্যদিকে তাঁর লেখায় এমন কতকগুলো বিষয় আছে

> যেগুলো পড়লে একজন পাঠকের মনে হতে পারে যে, ডয়েস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, শিল্পায়ন, শিক্ষা বিস্তার, যোগাযোগ এবং যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সমৃদ্ধ আধুনিকায়ন একক-সত্ত্বার (assimilation) জন্ম দিবে।[৩২]

কোনর (Conner) যুক্তি পেশ করেন যে, গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ জাতিরাষ্ট্রগুলোই বহুজাতিক (Multi-ethnic)। তাঁর প্রদত্ত উপাত্ত অনুযায়ী কেবলমাত্র দশভাগেরও কম রাষ্ট্র সত্যিকারভাবে সমজাতিক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্ব থেকে উদাহরণ টেনে তিনি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য যুক্তি পেশ করেন যে, "সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নৃ-জাতিক সচেতনতা বরং বেড়েই চলেছে, কমছেতো নয়ই।"

কোনর 'জাতি' (Nation) এবং রাষ্ট্র (State) এর মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন এবং বলেছেন যে, উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আনুগত্যতার প্ররোচনা দেয়। তাঁর 'জাতি' কে বুঝতে হবে একান্ত মানসপ্রসূত অনুভূতি হিসেবে। এটা বরং "একটা জনগোষ্ঠীর আত্ম-মনোভাব" (Self-view of one's group); কোন দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যাবলী নয় যেটা অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণ করে। তিনি বলেন :

> ... জাতিগত দ্বন্দ্বকে প্রায়শই অযাচিতভাবে ভাষা, ধর্ম, রীতিনীতি, অর্থনৈতিক অসমতা এবং অন্যান্য দৃশ্যমান বিষয়গুলো থেকে উদগত বলে ধরা হয়। কিন্তু এ ধরনের সংঘর্ষে মূলতঃ যেটা জড়িত সেটা হলো মৌলিক পরিচিতির বিচিত্রতা যেটা 'আমরা-তারা' (Us-them) মনোভাবে প্রকাশ পায়। আর একজন ব্যক্তির অন্তর্ভূক্তি 'আমাদের' না 'তাদের' মধ্যে এর চূড়ান্ত উত্তর বাহ্যিক সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি পালনের উপর খুব অল্পই নির্ভর করে।[৩৩]

এ ডি স্মিথ (A. D. Smith)

স্মিথ গ্যালনারের তত্ত্বের একটা বিস্তৃত সমালোচনা গড়ে তুলেছেন। তিনি এ তত্ত্বের ইতিবাচক দিকগুলোর প্রশংসা করেছেন। যেমন- আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার জটিলতা ও শিল্প আধুনিকতার বিভিন্নমুখী সম্ভাব্যতার মধ্যকার যোগসূত্রতা, শিক্ষা সংস্কৃতি ও শিল্প প্রতিযোগিতা এবং বিশ্বজনীন ও বিশেষিত বিষয়গুলোর মধ্যকার ভারসাম্য। তবে তিনি নিম্নের সমালোচনাগুলোও করেছেন : (১) গ্যালনারের তত্ত্ব শিল্প পূর্ব-জাতীয় আন্দোলনকে ধর্তব্যের ভিতরে গণ্য করেনা অথচ এটা প্রায়শই জনগণকে তাদের উদ্দেশ্য সাধনে প্ররোচিত করতে সফলতার পরিচয় দিয়েছিল; (২) তাঁর তত্ত্ব যেটা বলে তার বিপরীতে দেখা গিয়েছে যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সামাজিক গঠনটা ছিল বিভিন্নমুখী, শুধুমাত্র শিল্প-ভিত্তিক শ্রমিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; (৩) তাঁর তত্ত্বে অর্থনৈতিক পরিসিদ্ধান্তের একটা প্রচ্ছন্নভাব আছে যেটা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে বাধ্য

করে যে, বিশেষ ধরনের কাঠামো অবশ্যম্ভাবীভাবে বিশেষ ধরনের ফলাফল বহন করে। ফলশ্রুতিতে এটা ধারণা করা হয় যে, জাতীয়তাবাদ হলো একটা সাময়িক ব্যাপার যেটা আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে যাবে। ইউরোপ ও আমেরিকাতে সমসাময়িককালের জাতীয়তাবাদের উত্থানের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি যুক্তি পেশ করেছেন যে, জাতীয়তাবাদের বিবর্তন ও শিল্পায়নের মধ্যে কোন অত্যাবশকীয় সম্পর্ক নেই। তাঁর মৌলিক যুক্তি হলো যে, জাতীয়তাবাদ থাকবে এবং তা সম্ভবত চিরকালের জন্য।

আসল ব্যাপার হলো যে, বিশ্ব জাতি-রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কারণে আমরা এমন একটা পরিস্থিতিতে এসে পড়েছি যেখানে জাতীয়তাবাদ একটা স্ব-উদগত ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তাই জাতীয়তাবাদের দ্রুত নিশ্চিহ্ন হওয়ার বিশ্বব্যাপী প্রত্যাশাটা একটা দূরাশা, কারণ এ আশাগুলো বর্তমান সময়ের নৃ-জাতিক স্পর্শকাতরতা, ধর্মনিরপেক্ষ নীতি আদর্শ এবং আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার পরিবর্তনশীল কার্যকারণগুলোকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে।[৩৪]

স্মিথের এসব মতামতের ভিত্তি কি? তিনটা প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর অবস্থান নিরূপণ করতে চেষ্টা করবো: জাতীয়তাবাদ কি? কেন এটা এখনো এতো শক্তিশালী রূপে বেঁচে আছে? এবং কেন এটা সূদূর ভবিষ্যতে বেঁচে থাকবে?

স্মিথ মনে করেন যে, জাতীয়তাবাদের আধুনিকায়ন ক্ষমতার উপর ততোধিক গুরুত্বারোপ করাটা এর অতীতের নৃ-জাতিক শিকড়ের গুরুত্বকে উপেক্ষা করে। তিনি বলেন :

> ... জাতীয়তাবাদ বিষয়ক গবেষণা শুধুমাত্র ফরাসী ও শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কিত নতুন নতুন শক্তিসমূহের সাথেই নয় বরং আধুনিক যুগ-পূর্বের পুরাতন বন্ধন ও স্পর্শকাতরতাকেও এর মধ্যে গণনা করতে হবে।[৩৫]

স্মিথ এর মতে, জাতীয়তাবাদ হলো "একটা আদর্শিক আন্দোলন যেটা একটা বিশ্ব জনগোষ্ঠীকে তাদের স্বায়ত্ত্বতা ও স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করতে সাহায্য করে এবং ঐ জনগোষ্ঠীর একাংশ মনে করে যে তারাই আসল বা সুপ্ত জাতি।[৩৬] তিনি নৃ-জাতিক ও নগর ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিতর পার্থক্য টেনেছেন যেখানে প্রথমটা হলো প্রাচীনকালীন এবং পরেরটা আধুনিক যুগের। নগর-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের তিনটা অঙ্গকে তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ স্বায়ত্বতা, স্বাতন্ত্রতা ও বহুজাতিকতা (Pluralism)।

> মৌলিকভাবে জাতীয়তাবাদ তিনটা আদর্শকে একত্র করে ঃ জনগণের সামষ্টিক স্বাধীকার, জাতীয় বৈশিষ্ট্যাবলী ও স্বাতন্ত্রতার প্রকাশ এবং তৃতীয়ত বিশ্বকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করা যাতে প্রত্যেক জাতি মানবতার সাধারণ ইতিহাসে অবদান রাখে।[৩৭]

স্মিথ জাতীয়তাবাদকে ফ্যাসীবাদ, বর্ণবাদ, গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ থেকে আলাদা করেছেন। ফ্যাসীবাদ হলো আলাদা কারণ এর উদ্দেশ্য আলাদা এবং এর সামাজিক

ভিত্তিও আলাদা। তাই এটা যুদ্ধ মধ্যবর্তীকালীন সময়ের বিশেষ ব্যাপার। সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ এবং গণতন্ত্র হলো জাতীয়তাবাদের মৌলিক গুণাবলীর সঙ্গে সংঘর্ষশীল।[৩৮]

কেন জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী রূপে বেঁচে থাকলো? স্মিথ এ প্রশ্নের চারটা কারণ পেশ করেছেন।[৩৯] (১) নৃ-জাতিক পুনঃজাগরণ ঠেকাতে কিংবা প্রশমিত করতে আধুনিক রাষ্ট্রের ব্যর্থতা (২) সমজাতীয়করণ বা একীভূতকরণে জাতি রাষ্ট্র ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় অভিজাত শ্রেণীর উপর চাপ প্রয়োগের নেতিবাচক ফলাফল, (৩) জাতীয়তাবাদী নীতি-আদর্শ এবং আন্দোলনের চলমান প্রতিক্রিয়া এবং (৪) অসম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বুদ্ধিবৃত্তিক গোষ্ঠীর বিদ্রোহ।

জাতীয়তাবাদ কেন বেঁচে থাকবে? স্মিথ এর উত্তর হলো :

> মূল ব্যাপার হলো যে, জাতীয়তাবাদের বেঁচে থাকাটা, এমনকি এর প্রাথমিক রাজনৈতিক দাবীগুলো মেটানো কিংবা আধুনিকায়ন সম্পন্ন হওয়ার পরও, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থারই একটা কার্যকারণ। প্রাথমিকভাবে জাতীয়তাবাদ হয়তোবা এ ব্যবস্থার গোড়াপত্তনে সাহায্য করেছে। এখন পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থাই এটাকে বাঁচিয়ে রাখছে। ঠিক যেমন শিল্পযন্ত্র এখন পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রেখেছে যেটা প্রথমে শিল্পবাদের জন্ম দিয়েছিল।[৪০]

মূল্যায়ন

আন্তজার্তিক সম্পর্কের উপর জাতীয়তাবাদের কি সম্ভাব্য প্রভাব পড়বে সে ব্যাপারে মূলধারার উদারবাদী চিন্তাবিদগণের দুটো মতামত রয়েছে ঃ (১) একটা মতামত একীভূতকরণ এবং অন্যটা বিচ্ছিন্নতার পক্ষে। হানস কুন মনে করেন জাতীয়তাবাদ হলো একটা ইতিবাচক শক্তি যেটা জনগণের বৃহত্তর অংশগ্রহণকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং পরিশেষে পাশ্চাত্য উদার মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে বিশ্ব পর্যায়ে একটা নতুন ধরনের একীভূতকরণের দিকে নিয়ে যাবে। তিনি জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত (Enlightenment) মুল্যবোধকে লালন করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে এটার ভিত্তিতে একটা বিশ্ব ঐক্য গঠিত হবে।

মূলধারার অন্যান্য চিন্তাবিদগণ যেমন টোয়েনবী,কার এবং হায়েস সভ্যতার বিচ্ছিন্নতাকে একটা মৌলিক প্রবণতা হিসেবে ধরে নিয়েছেন এবং বিভিন্ন জাতীয়তাবাদকে এর জন্য দায়ী করেছেন। তাঁদের মতে ধর্মহীনতা, গণতন্ত্র ও শিল্পবাদের উত্থানের ফলশ্রুতিতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব ব্যবস্থার গঠনে তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকাকে মুখ্য হিসাবে গণ্য করেছেন। তাঁরা জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে একই সমান্তরাল রেখায় ফেলেছেন যাতে একে অপরের উপর প্রভাব ফেলে রাজনীতিতে পর্যায়ক্রমিক অংশগ্রহণকে বৃদ্ধি করে। বিশেষভাবে তাঁরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর জাতীয়তাবাদের প্রভাবের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন কারণ এটা অন্যের প্রতি ঘৃণা, আন্তর্জাতিক শত্রুতা এবং দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দিয়েছে। তাঁদের মূল্যবোধের ভিত্তি বেশ পরিস্কার। তাঁদের মতে যদি এসব মতবাদ তাদের মূল্যবোধকে

হারিয়ে শুধুমাত্র পেশীশক্তির উপর নির্ভর করতে শুরু করে, তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সাম্প্রদায়িক অনুভূতি সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকের আধুনিক চিন্তাবিদগণের মতানুযায়ী একীভূতকরণ হলো মূল প্রবণতা। তাঁদের লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদের উপর যেটাকে তাঁরা প্রায় নাগালের মধ্যে বলে গণ্য করতেন এবং জাতীয়তাবাদকে একটা মীমাংসিত ব্যাপার বলে উপেক্ষা করতেন। পশ্চিম ইউরোপকে মডেল হিসেবে গণ্য করতেন, কিন্তু আন্তর্জাতিকতাবাদ তত্ত্বকে বিশ্বব্যাপী প্রযোজ্য বলে মনে করতেন। তাঁরা ছিলেন বিজ্ঞানভিত্তিক ও মূল্যবোধ নিরপেক্ষ। তিরিশ বছরের গবেষণায় চিন্তাবিদগণ দেখলেন যে, বিশ্ব তাঁদের তত্ত্বের সঙ্গে মিল রেখে অগ্রসর হয়নি। আর বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ইউরোপ-কেন্দ্রিক। তাঁদের তাত্ত্বিক ধারণা এবং এর পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার বিস্তারিত প্রস্তাবনা ছিল অত্যাবশকীয়ভাবে একপাক্ষিক এবং বাস্তবতার শুধুমাত্র একটা দিককেই তুলে ধরেছিল। তাঁরা আন্তর্জাতিকতাবাদ, একীভূতকরণ ও আন্তঃ নির্ভরশীলতার উপর গবেষণা করেছেন কিন্তু জাতীয়তাবাদ, বিচ্ছিন্নতা ও নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব কমই দিয়েছেন। তবে জাতীয়তাবাদের উপর অধিকতর সমাজতত্ত্ব নির্ভর গবেষণা, যেমন কার্ল ডয়েস-এর সময়কে অতিক্রম করে বেঁচে ছিল। একীভূতকরণ ও বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এখনো প্রযোজ্য। অধিকন্তু, তাঁর তত্ত্ব একদল উত্তর আধুনিক চিন্তাবিদের জন্ম দিয়েছে যাদের মতামতকে বলা যায় চিন্তা পরিগণ্ডীর পুনর্বাসন।

উত্তর আমেরিকান চিন্তাবিদগণের মধ্যে ওয়াকার কোনর এর দৃষ্টান্তমূলক গবেষণা তুলনামূলক নৃ-জাতি গবেষণার এক নতুন দ্বার উন্মোচন করে।[৪১] এ গবেষণার প্রাথমিক বিষয় হলো খণ্ড-বিখণ্ডতা। ওয়াকার কোনর-এর কর্মের গুরুত্ব হলো যে, তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতি অধ্যয়নে একটা নতুন মাত্রার সংযোজন করেছেন। নৃ-জাতির গ্রুপের উপর তার বিশেষ মনোযোগ একাধিক আনুগত্যের ব্যাপারটাকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। একজন ব্যক্তি একাধিক বিষয়ের প্রতি আনুগত্য রাখতে পারে, আর জাতি-রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যতা এমন একটা আনুগত্যতা মাত্র। প্রশ্ন হলো ঃ কোন পরিচিতিটা কোন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক পরিচিতি পায়? বিভিন্ন মতধারা এ বিষয়ে বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাচীনতাবাদীরা গুরুত্ব দিয়েছেন সাংস্কৃতিক ব্যাপারগুলোকে,[৪২] অন্যরা গুরুত্ব দিয়েছেন আধুনিকায়ন, গ্রুপ প্রতিযোগিতা এবং পরিবর্তনশীল নৃ-জাতিক আত্ম সচেতনতাকে।[৪৩]

একটা ব্যাপার অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে যে, নৃ-জাতিক (Ethnic) বলতে ঐ সকল লেখকেরা বিভিন্ন প্রকারের আনুগত্যকে একই সঙ্গে বুঝাতে চেয়েছেন যেমন গোত্র বর্ণগত বা ধর্মীয়। এটা অবশ্যই তাঁদের কৃতিত্ব যে, তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্নমুখী বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন এবং বাস্তবতার বিভিন্নমুখীতাকে ফুটিয়ে তুলতে বিভিন্ন তত্ত্বের অসম্পূর্ণতাকে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু তাঁরাও তাঁদের নিজস্ব উপলব্ধির আলোকে বাস্তবতাকে এক প্রকার সহজ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

জাতীয়তাবাদকে একটা সুন্দর অবয়ব প্রদানে এ ডি স্মিথের গবেষণা একটা সাহসী পদক্ষেপ। তিনি কিছু মৌলিক ধারণামূলক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন কিন্তু তাঁর যুক্তিগুলো মুলতঃ একটা বিশেষ প্রকারের জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ উদার জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করে। জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসীবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে তাঁর তীক্ষ্ণ পার্থক্যকরণ শুধুমাত্র মুখোশ উন্মোচনকারীই নয় বরং অনৈতিহাসিকও বটে। ফ্যাসীবাদ, বর্ণবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ থেকে জাতীয়তাবাদকে পৃথকীকরণ প্রায় নৈতিকতার পর্যায়ে পড়ে যেটা প্রাথমিকভাবে সু-জাতীয়তাবাদ এবং কু-জাতীয়তাবাদে বিভক্ত করে।[৪৪] ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি কিভাবে মূলধারার লেখকেরা জাতীয়তাবাদকে এবং এর বিভিন্ন প্রকারকে একই মাপকাঠিতে বিচার করেছেন যেখানে সেগুলো একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জাতীয়তাবাদের চলমান চালিকা শক্তির ব্যাপারে তাঁর যুক্তিটাও অর্ধ সত্য মাত্র এবং দৃশ্যতঃ তা বর্তমান অবস্থাকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা বৈ কিছুই না। এটা স্থিতিশীল এবং বাস্তবতার ক্রমপরিবর্তনশীলতার সম্ভাব্যতাকে অগ্রাহ্য করে ❐

দ্বিতীয় অধ্যায়
মার্কসবাদ

মার্কসবাদী চিন্তা ধারার নিজস্ব প্রকৃতিগত কারণে আন্তর্জাতিকতাবাদী মার্কসবাদ এর প্রতিষ্ঠাতা চিন্তাবিদদের স্বপ্ন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংকট উত্তরণে জাতীয়তাবাদকে উদীয়মান প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করে এর সংকট উত্তরনের পরিপ্রেক্ষিতে। মার্কসীয় চিন্তাধারাকে আমরা এখানে পেশ করব প্রথমতঃ এর মূল ধারার চিন্তাবিদ-কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এর চিন্তাধারার পর্যালোচনার মাধমে। মার্কসবাদী চিন্তাচেতনার গঠন প্রক্রিয়ায় এ দুইজন মনীষীর ভূমিকাই ছিল মূল ভিত্তি।

ঐতিহ্যবাদী চিন্তাবিদগণ

মার্কস ও এঙ্গেলস

প্রথমেই এটা পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন যে, জাতীয়তাবাদ বিষয়ে মার্কস বা এঙ্গেলস কারোরই যুক্তিসম্পন্ন এবং সুস্পষ্ট মতবাদ ছিল না। এটার কারণ হলো যে এ বিষয়টা তাদের প্রাথমিক ধর্তব্য বিষয় ছিল না। তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলেন। তাঁদের মূল অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টোতে (Communist Manifesto)। তাঁরা পুঁজিবাদকে বর্ণনা করেছেন "জাতিসমূহের বিশ্বব্যাপী আন্ত ঃনির্ভরীলতার" উদ্রেককারী হিসেবে। তাঁদের মতে-

> মানুষের মধ্যকার জাতীয় মতপার্থক্য ও বিভিন্নতা এবং অন্তর্দ্বন্দ্বতা ক্রমেই নিঃশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হলো বর্জুয়া গোষ্ঠীর উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা, বিশ্ববাজার, উৎপাদন ব্যবস্থার সমজাতীয়তা এবং এগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল জীবনধারার প্রচলন।[১]

পুঁজিবাদের বিশ্বায়ন থেকে উদ্ভুত একটা প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক সমাজের স্বপ্ন কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস দেখেছিলেন। তাঁদের অতি আদর্শবাদ গঠিত ছিল একটা শোষণহীন, শ্রেণীহীন, জাতীয়তাত্তোর মানব সমাজ। তাঁদের প্রাথমিক ধর্তব্য বিষয় ছিল সর্বশেষ একীভূতকরণ।

তাঁদের মতে জাতীয়তাবাদ ছিল পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর মতাদর্শ, Superstructure- এর একটা অঙ্গ, তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। এটা ইতিহাসের বিশেষ স্তরে বিভিন্ন জনবসতিকে একটা মাত্র জাতিতে একীভূতকরণ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য সাধনে কার্যকর ছিল।[২] তাঁদের মতে রাষ্ট্র এবং জাতির পারস্পরিক সম্পর্কের উদ্ভব হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদের উত্তোরণের

মধ্যে। রাষ্ট্রযন্ত্র বর্জুয়া শক্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল, আর জাতীয়তা পরিগণিত হয়েছিল এ মতাদর্শের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে যার উপর ভিত্তি করে বর্জুয়া শ্রেণী একদিকে তাদের শ্রমজীবি ও কৃষিজীবীদের উপর প্রভূত্ব কায়েম করেছিল এবং অন্যদিকে ভিন্ন জাতির মোকাবেলায় নিজেদের জাতীয়তাবাদকে সুসংহত করেছিল। তবে এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মার্কস ও এঙ্গেলস দেখতে পেয়েছিলেন পুঁজিবাদী জাতি রাষ্ট্র থেকে আন্তর্জাতিক সমাজবাদী সমাজে উত্তরণে ইতিহাসের গতিধারাকে। শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতি তাঁদের উপদেশ ছিল :

> মৌলিকতায় না হলেও অন্ততঃ আপাতঃদৃষ্টিতে বর্জুয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারীয়দের সংগ্রামটা প্রথমতঃ একটা জাতীয় সংগ্রাম। প্রতিটা দেশের প্রলেতারীয়েতদের অবশ্যই সবার আগে তাদের নিজেদের বর্জুয়া শ্রেণীর সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করতে হবে ... শ্রমজীবী শ্রেণী কোন দেশের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। তাদের কাছ থেকে আমরা এমন কিছু ছিনিয়ে নিতে পারিনা যা তাদের আদৌ নেই। যেহেতু প্রলেতারিয়েতদের অবশ্যই প্রথমে রাজনৈতিক আধিপত্যতা অর্জন করতে হবে, অবশ্যই জাতীয়ভাবে শাসক শ্রেণীতে উন্নয়নের জন্য জেগে উঠতে হবে, অবশ্যই তাদেরকে এটা জাতিতে পরিগণিত করতে হবে- তাই এটা আসলে একটা জাতীয়তাবাদ যদিও তা বর্জুয়া ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী নয়। ... দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ, এক হও।[৩]

মার্কস এবং এঙ্গেলস মাঝে মাঝে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছেন, বিশেষতঃ পোল্যাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ড এর প্রতি। কিন্তু তাঁদের এতদ সমর্থন উপরে বর্ণিত অবস্থানের সঙ্গে সংঘর্ষশীল ছিল না কারণ তাঁরা মনে করতেন এটা সাম্যবাদী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।[৪] একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রগতিশীল না বিপ্লবী সেটা নির্ভর করে এর গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্যের উপর। জাতি-উত্তর-সাম্যবাদী সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়তাবাদকে এটা মাধ্যম হিসেবে গণনা করা হয়েছিল।

আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ

লেলিন

সমাজতান্ত্রিক ধারায় লেনিন ছিলেন একজন সত্যিকারের আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী। তিনি বিশেষ কিছু চমৎকার পদ্ধতিতে মূলধারার মার্কসীয় মতবাদকে পুনঃসংস্কারিত এবং এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মার্কসবাদ আসলে কখনো জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সমঝোতায় আসবে না, তা সে জাতীয়তাবাদ যতই সত্যিকার, নিরংকুশ বা নির্ভেজাল হোক না কেন; কারণ মার্কসবাদের লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদ যেটা ততোধিক উচ্চস্তরে সকল জাতির মহামিশ্রণ।[৫] লেনিনের অবস্থানকে ভালভাবে

অনুধাবন করতে হলে তার সমসাময়িক পরিস্থিতি তথা তাঁর বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক ধারার ভিতরেই পেশকৃত দু'টো বিকল্প মতামতকে বিবেচনায় আনতে হবে। প্রথম মতামতের প্রবক্তা ছিলেন জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদী কার্ল রেনার (Karl Renner) এবং অটো বুয়ার (Otto Bauer) এবং দ্বিতীয় মতামতের প্রবক্তা ছিলন মার্কসীয় আন্ত র্জাতিকতাবাদী রোসা লুক্সেমবার্গ (Rosa Luxemburg), নিকোলাই বুখারিন (Nikolai Bukharin), কার্ল রেদেক (Karl Redek), গ্রেগরী পিয়াতাকভ (Gregori Piatakov) এবং ত্রোতোস্কি (Trotsky)।

জাতীয়তা বিষয়ে লেনিন গুরুতরভাবে চিন্তা শুরু করেন ১৯১৩ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চরম উৎকণ্ঠাপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিবেশের কারণে জাতীয়তার প্রশ্নটাকে সবার আগে পেশ করা হয়েছিল।[৬] তদুপরি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল যে, জাতীয়তাবাদ সমাজবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ মতবাদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। আর এটা প্রভাবিত করেছিল সমাজতান্ত্রিক দলের বিভিন্ন স্তর এবং এর সম্ভাব্য ক্ষেত্র প্রলেতারিয়েত সমাজ। লেনিনের মতে-

> ... সাম্রাজ্যবাদের যুগে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী দুটো আন্ত র্জাতিকতাবাদী শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে; একটা শিবির আধিপত্য বিস্তারকারী জাতিগুলোর বর্জুয়া শ্রেণী দ্বারা কলুষিত হয়েছে ... আর দ্বিতীয়টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর মুক্তি আনয়ন ছাড়া, আম-জনতাকে- হিংস্র জাতীয়তাবাদ বিরোধী অর্থাৎ আগ্রাসন বিরোধী স্ব-অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে শিক্ষা দেয়া ছাড়া নিজেদের মুক্ত করতে পারে না।[৭]

জাতীয় সমাজতান্ত্রিকতাবাদীদের অবস্থান

কার্ল রেনার এবং অটো বুয়ার মনে করেন যে জাতি হলো মানব সমাজের বহমান ধারা। তাঁদের মতানুযায়ী জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা শ্রেণী বিশ্লেষণবাদকে জাতি রাষ্ট্রের অধীনস্থ করে ফেলে। তার অর্থ হলো মূল মার্কসীয় মতবাদকে উল্টিয়ে ফেলা যাতে শ্রেণীসংগ্রাম হলো মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, আর জাতি-রাষ্ট্র হলো নিতান্তই কাঠামো যেটা পরিবর্তনশীল। বুয়ারের মতে- "ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশাল জাতি রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়াটা একটা বিশেষ যুগের দিক নির্দেশক যখন জাতীয়তার মূলনীতিগুলো পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে ... সমাজতন্ত্রবাদ অত্যাবশকীয়ভাবে জাতীয়তাবাদের মূলনীতিকে প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে নেয় ... সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা অর্জিত মানুষের পরিবর্তন অত্যাবশকীয়ভাবে মনুষ্য সমাজকে জাতীয়তার ভিত্তিতে সংগঠিত করে শ্রমের আন্ত র্জাতিক বিভেদ অত্যাবশকীয়ভাবে জাতীয় সমাজগুলোকে আরেকটা উন্নততর সামাজিক স্তরে সংঘবদ্ধ করে। সমস্ত জাতিগুলোই প্রাকৃতিক শক্তির আধিপত্যতায় একতাবদ্ধ হবে, তবে সামগ্রিকতা প্রকাশ পাবে জাতীয় বিভিন্নতায় যেটা স্বতন্ত্রভাবে প্রস্ফুটিত হবে এবং তাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে পুরোপুরিভাবে উপভোগ করবে..."[৮]

প্রকৃতপক্ষে তাঁদের এ মতামত পাশ্চাত্যের লিবারেল জাতীয়তাবাদী ধারার সঙ্গে তেমন একটা বিশেষ পার্থক্য নির্দেশ করে না, যে ধারা মনে করে যে, জাতীয় রাষ্ট্র হলো একটা প্রকৃতিগত বিষয়; আর যেটা আন্তর্জাতিকতাবাদকে জাতীয় রাষ্ট্রের দর্পণে মূল্যায়ন করে।

আন্তর্জাতিকতাবাদীদের অবস্থান

রোসা লুক্সেমবার্গ, বুখারিন এবং অন্যান্যরা ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী। তাঁদের মতে আত্ম-স্বাধীকারবাদ হলো বর্জুয়া বুলি। তাঁদের মতে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে বৃহৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রবণতা হলো আরো বৃহত্তর আকার ধারণ করা। এ প্রবণতা হলো এর প্রকৃতিগত আচরণ তাই এর সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে লড়াই করা যাবেনা; বরং একমাত্র সমাধান হলো পুরো পুঁজিবাদকেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। বলশেভিকদের উচিৎ না প্রলেতারিয়েতদের এমন উপদেশ দেয়া যে, তারা পুঁজিবাদী বলয়ের ভিতরে থেকে জাতীয় আত্ম-স্বাধীকার বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করুক। কারণ এমনতর উপদেশ হবে নিছক আকাশ-কুসুম ভাবনা আর মরিচিকা উদ্রেককারী। রোসা, লুক্সেমবার্গ মনে করেন জাতীয় আত্ম-স্বাধীকার এর স্লোগান হলো বর্জুয়া শাসনের মুখোশ স্বরূপ :

> ... পুঁজিবাদের অধীনে জনগণের আত্ম-স্বাধীকার বলে কিছু নেই। একটা শ্রেণীভিত্তিক সমাজে প্রত্যেকটা শ্রেণীই ভিন্ন ভিন্ন আদলে নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে। আর বর্জুয়া শ্রেণীর ব্যাপার হলো যে, জাতীয় স্বাধীনতার বিষয়টা পুরোপুরি শ্রেণী শাসনের দ্বারা অধীনস্থ।[৯]

তাঁর মতে জাতীয়তাবাদ হলো একটা আবরণ যেটাকে পররাষ্ট্র নীতিতে রূপান্তর করলে তা সাম্রাজ্যবাদী বাসনা ও প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়।

তাঁদের মতে যেহেতু সমাজতন্ত্রবাদ সাধারণতঃ যে কোন ধরনের অত্যাচার নির্যাতনের বিরোধী তাই আত্ম-স্বাধীকার এর অধিকারের মত বর্জুয়া শ্লোগান ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন জাতীয় প্রলেতারিয়েতদের জন্য একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে সকল শ্রমিকদের উচিত সরাসরি সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করা। রোসা এবং লুক্সেমবার্গ লেনিনের (Self-determination) নীতিকে এ বলে সমালোচনা করেছেন যে এটা একটা "সুবিধাবাদী নীতি" যেটা অবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্নতার পথে ঠেলে দেবে।

লেনিনের মতামত

লেনিন উপরোক্ত দুটো মতেরই ঘোর সমালোচক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অষ্ট্রিয়ার সমাজবাদী এবং ইহুদী Bundists-দের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন নিঃসন্দেহে প্রলেতারিয়েতদের আন্তর্জাতিকতাবাদের সাথে সংঘর্ষশীল এবং জাতীয়তাবাদী পেটি বর্জুয়াদের আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। তাঁর কথায়:

> জাতীয় সাংস্কৃতিক শ্লোগান হলো বর্জুয়াবাদের নামান্তর ... এটা একটা ভুয়া ব্যাপার। আমাদের শ্লোগান হলো- গণতন্ত্র এবং বিশ্ব মজদুর আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি ... যারা জাতীয় সংস্কৃতির প্রবক্তা তাদের স্থান জাতীয়তাবাদী পেটি বর্জুয়াদের কাতারে, মার্কসবাদীদের কাতারে নয়।[১১]

একইভাবে, লেনিন তাদেরকে দোষারোপ করেছেন-"শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যকার বর্জুয়া জাতীয়তাবাদী ক্রীড়ানক" বলে। আত্ম-স্বাধীকার এর গুরুত্বকে অনুধাবন না করার জন্য লেনিন, রোসা, লুক্সেমবার্গ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিকতাবাদীদেরকে এ বলে সমালোচনা করেছেন যে, তারা অবচেতনভাবে একটা ভিন্ন ধরণের সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকেই সমর্থন করেছে। আত্ম-প্রতিষ্ঠার (Self-determination) অধিকার বলতে তিনি বুঝিয়েছেন প্রকৃতার্থে পৃথক হওয়ার অধিকার।

জাতীয় আন্দোলনের উৎপত্তি হলো কেন? এর উত্তরে লেনিন বলেছেন–

> বিশ্বব্যাপী এটাই ঘটেছে যে, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত বিজয়ের সময়টা জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এ আন্দোলনের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল এটাই যে, পণ্য উৎপাদনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য বর্জুয়াদের জন্য অত্যাবশকীয় ছিল অভ্যন্তরীণ বাজার দখল করা, একই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী সম্পন্ন রাজনৈতিক ভূ-সীমা অর্জন করা, এবং এতদভাষার উন্নয়ন এবং এর সাহিত্যিক সুদৃঢ়তা অর্জনের পথে সমস্ত বিঘ্নতাকে দূরীভূত করা।[১৩]

লেনিন বিশ্বাস করতেন জাতীয়তাবাদ হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য, তাই এটা পুঁজিবাদের সমৃদ্ধতার সাথে সাথে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

> জাতীয়তার প্রশ্নে ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদ দুটো ঐতিহাসিক প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন। প্রথমটা হলো জাতিসত্ত্বা এবং জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপারে স্ব-উপলব্ধি, জাতীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং জাতি রাষ্ট্র সৃষ্টি করা। আর দ্বিতীয়টা হলো সর্বপ্রকারের আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের উন্নয়ন এবং ক্রমোন্নতি, জাতিরাষ্ট্রের সীমানা দূরীভূত হওয়া, মূলধন, অর্থনৈতিক জীবন, রাজনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদির আন্তর্জাতিক ঐক্যের সৃষ্টি হওয়া।

এ উভয় প্রবণতাই হলো পুঁজিবাদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। প্রথমটা পুঁজিবাদের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে আধিপত্য বিস্তার করে; আর দ্বিতীয়টা পুঁজিবাদের পরিপক্কতার বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলে যেটা হলো সমাজবাদী সমাজের প্রতি এর রূপান্তরিত হওয়ার গতি।[১৪]

লেনিন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে জাতীয়তাবাদ হলো একটা যুগসন্ধিক্ষণ। তিনি বলেন–

> যেমনিভাবে মানবজাতি কেবলমাত্র নির্যাতিত শ্রেণীর স্বৈরতন্ত্রতার মাধ্যমে সকল প্রকার শ্রেণী বৈষম্যকে দূর করতে পারে, ঠিক তেমনিভাবে সকল নির্যাতিত জাতির পরিপূর্ণ মুক্তির অর্থাৎ স্বাধীন হওয়ার অধিকারের মধ্য দিয়ে সমগ্র মানবজাতি একটা অবশ্যম্ভাবী জাতিপুঞ্জের সংমিশ্রণে পরিণত হতে পারে।[১৫]

লেনিন মনে করতেন যে, প্রত্যেক সমাজেই গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপকরণ বর্জুয়া সংস্কৃতির পাশাপাশি অবস্থান করে। সমাজবাদীদের উচিত বর্জুয়াদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ঐসব গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক উপকরণকে সমর্থন করা। তাঁর লেখনীতে এটা পরিদৃশ্যমান যে, শ্রেণী নির্যাতনের কারণগুলো দূরীভূত হওয়ার পর জাতিসমূহের স্বেচ্ছানির্ভর পুনঃসংঘবদ্ধতার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জার শাসিত রাশিয়া হলো "জনগণের কারাগার"[১৬] তাই বিভিন্ন গোষ্ঠী জাতিগুলো সমাজবাদের অধীনে স্বেচ্ছায় পুনঃসংগঠিত হবে।

লেনিন আত্ম-স্বাধীকার এর অন্যায্য অধিকারে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে, কম্যুনিষ্ট আন্দোলন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রবিশেষে বিবেচনা করে দেখবে যে আত্ম-স্বাধীকারের অধিকারের প্রতি সমর্থন দেয়াটা এ আন্দোলনের আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্য অর্জনকে সহায়তা করবে কিনা। লেনিন বিশেষভাবে আশাবাদী ছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং এশিয়া ও আফ্রিকার জেগে ওঠা জাতীয় মুক্ত আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটা সম্ভাব্য ঐক্য গড়ে উঠবে। তিনি লিখেছেন :

> রাশিয়া, পারস্য, তুর্কী এবং চীনের বিপ্লব, বলকান যুদ্ধ এসবই হলো আমাদের সময়ের বিশ্বের ঘটনা পরম্পরা। শুধুমাত্র অন্ধব্যক্তির পক্ষে এটা না দেখা সম্ভব যে, এ ঘটনা পরম্পরার মধ্যে বর্জুয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি আত্ম-জাগ্রত ঢেউ জেগে উঠেছে যেটা জাতীয়ভাবে স্বাধীন ও সমজাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত।[১৭]

এ জাতীয় চিন্তাধারার পিছনে বাস্তববাদী ও আদর্শবাদী উভয় প্রকারের কারণ নিহিত আছে। লেনিনের চিন্তায় "দু-স্তর" বিশিষ্ট বিপ্লবের ধারণা প্রোথিত ছিল। প্রথম স্তরে কুম্যুনিষ্টরা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জাতীয় বর্জুয়াদের সমর্থন দেবে কিন্তু নিজেদেরকে ওদের মধ্যে বিলীন করে দেবে না, আর দ্বিতীয় স্তরে কম্যুনিষ্টরা নিজেরাই ক্ষমতা দখল করবে।

লেনিন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিতরে অ-রুশীয় জনগণের প্রতি নির্যাতন, সাম্রাজ্যবাদ ও অবিচারের ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর ছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলোতে বিভিন্ন জাতীয়তার প্রতি স্টালিনের নীতির ব্যাপারে তিনি ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁর ভয় ছিল একটা সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ রুশ-জাতীয়তাবাদের পুনঃ আবির্ভাব ঠিক যেমনটা জারের শাসনামলে ছিল। ইউক্রেনীয় জনগণের প্রতি অসদাচারণের ঘটনাবলীকে সমালোচনা করে তিনি স্টালিনকে লিখেছেন :

> এটা ক্ষমার অযোগ্য একটা ব্যাপার হবে যদি আমরা, পূর্ববাসীদের আত্ম-জাগরণের পূর্বমুহূর্তে, আমাদের নিজেদের ক্ষমতাকে জনগণের সামনে অগ্রহণযোগ্য করে তুলি, এমনকি আমাদের অ-রুশীয় জনগণের প্রতি সামান্যতম নিষ্ঠুরতা বা অবিচারের মাধ্যমে হলেও।[১৮]

স্টালিন

স্টালিনের মতে জাতি হলো-"ঐতিহাসিকভাবে সংগঠিত একটা স্থিতিসম্পন্ন জনগণ যেটা একই ভাষা, ভৌগলিক সীমানা, অর্থনৈতিক জীবনধারা এবং মনঃস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে গড়ে উঠেছে এবং একটা সমজাতীয় সংস্কৃতিতে বিকাশিত হয়েছে।"[১৯]

লেনিনের মতের সঙ্গে স্টালিনের মতামত দুটো বড় বিষয়ে পার্থক্য রচনা করে। প্রথমতঃ স্টালিন সর্বশক্তি নিয়োগ করে অষ্ট্রীয় সমাজবাদী এবং ইহুদী বুণ্ডীষ্ট (Bundist) পার্টির সাংস্কৃতিক স্বায়ত্বশাসনকে আক্রমণ করেছেন, কিন্তু লেনিনের মত আন্তর্জাতিকতাবাদীদেরকে আক্রমণ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ তিনি একীভূতকরণের তিনটা স্তরের মধ্যে পার্থক্য করেছেন : (১) একদেশভিত্তিক সমাজবাদ (২) প্রলেতারিয়েতদের নিরংকুশ শাসন এবং (৩) বিশ্ব সমাজবাদী গোষ্ঠী।

জাতীয়তাবাদী সমাজবাদীদের অবস্থানকে আক্রমণ করে তিনি পুনঃব্যক্ত করেছেন:

১. জাতীয় সমাজবাদীরা মনে করে যে, জাতি হলো একটা নৈর্ব্যক্তিক প্রদত্ত এবং স্থায়ী বিষয়। তারা ভুলে যায় যে এটা একটা ঐতিহাসিক বিষয়, বিকাশমান পুঁজিবাদের একটা ফল এবং এটা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তনযোগ্য।

১. তারা ভুলে যায় যে, জাতীয়তাবাদ মৌলিকভাবে সর্বদাই এটা বর্জুয়া মতাদর্শ, আর জাতীয় আন্দোলন প্রাথমিকভাবে বর্জুয়া শ্রেণীর উপকারেই চালিত হয়।

২. তারা শ্রেণীর সংগ্রামের মূলনীতিকে জাতীয়তার মূলনীতিতে পর্যবসিত করে, যেটা মার্কস-লেনিনীয় মতাদর্শ থেকে বিচ্যুতি হওয়ারই নামান্তর।

৩. তারা এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে যে, পুঁজিবাদের পরিপক্কতার যুগে জন-স্থানান্তর, শহরায়ন এবং শিল্পায়নের ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠী ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে শুরু করে। পুরাতন পরিচয় নতুন পরিচয় দ্বারা ঢাকা পড়ে। শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র হওয়ার সাথে সাথে জাতীয় সংস্কৃতিও দুটো বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে- (১) বর্জুয়া সংস্কৃতি ও (২) প্রলেতারিয়েত সংস্কৃতি।

তাঁর মতে একীভূতকরণের নিম্নোক্ত তিনটা ধাপ রয়েছে :

> ... প্রথম ধাপ হলো যখন জাতীয় অবিচার নির্যাতন পুরোপুরিভাবে রহিত হবে, আমরা ইতোপূর্বের নির্যাতিত জাতিগুলোর বিকাশ ও প্রস্ফুটনকে দেখতে পাব, আরো দেখতে পাব পারস্পরিক জাতীয় অবিশ্বাসের বিলুপ্তি এবং জাতিসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক যোগসূত্রতার প্রতিষ্ঠা ও এর সুসংহতি।

> শুধুমাত্র প্রলেতারিয়েতদের বিশ্বব্যাপী নিরংকুশ শাসনামলের দ্বিতীয় ধাপে একটা একক সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থ-ব্যবস্থা গড়ে উঠবে যেটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্থান দখল করবে। কেবলমাত্র এ ধাপেই একটা একক ভাষার মত কোন কিছুর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে। কারণ এ ধাপে এসেই জাতিসমূহ তাদের নিজস্ব ভাষার পাশাপাশি একটা একক আন্তর্জাতিক ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে যেটা তাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হবে।
>
> পরবর্তী ধাপে... যখন বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যথেষ্টভাবে সুসংহত হবে এবং সমাজবাদ মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে যাবে এবং যখন দৈনন্দিন অনুশীলনের কারণে একটা একক ভাষা অন্যান্য জাতীয় ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবে, তখন জাতীয় মতপার্থক্য ও ভাষাগত বিভিন্নতা বিলুপ্ত হতে শুরু করবে এবং সমগ্র জাতির জন্য একটা বিশ্বজনীন ভাষার প্রবর্তণে সহায়তা করবে।[২০]

মাও সে তুং

অনিচ্ছাসত্ত্বে হলেও মাও সে তুং চৈনিক সংখ্যালঘুদের প্রতি স্বাধীকারের অধিকার প্রদানের সোভিয়েত উপদেশ প্রয়োগ করেছিলেন। চায়নিজ কম্যুনিষ্ট পার্টি জাতীয়তার প্রশ্নে পরস্পর সংঘর্ষশীল অবস্থান গ্রহণ করেছিল। একদিকে সংখ্যালঘুদেরকে স্বাধীকারের প্রতিজ্ঞা করেছিল, আবার অন্যদিকে এ সাথে হান সংখ্যাগুরু এলাকাতে হান দেশপ্রেমকে উসকে দিয়েছিল।[২১] যাই হোক, ঐতিহাসিক লং মার্চের সময়ে স্বাধীকারের প্রতি মৌখিক প্রতিজ্ঞা বেশ কার্যকরী হয়ে দেখা দিয়েছিল, চায়নিজ কম্যুনিষ্ট পার্টি এর ফলে সংখ্যালঘুদের সমর্থন লাভে কৃতকার্য হয়েছিল। প্রভাবশালী হান সংখ্যাগুরুদের ক্রমবর্ধমান সমর্থন এবং ক্ষমতায় আরোহনের সমূহ সম্ভাবনার আলোকে চৈনিক জাতীয়তাবাদ অধিকন্তু গুরুত্ব পেতে শুরু করে। মাও স্টালিনের জাতীয়তা বিষয়ক নীতিমালাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।[২২] ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের পর এটা সরকারী পর্যায়ে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হলো যে,"গণপ্রজাতন্ত্র চীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে কোন জাতীয়তাবাদী স্বাধীন আন্দোলনকে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে গণ্য করা হবে।"[২৩]

মাও-এর নীতি লেনিনের আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ অপেক্ষা স্টালিনের চিন্তাধারার সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল ছিল। চৌ এন লাই এ ব্যাপারে সোভিয়েত অভিজ্ঞতার সঙ্গে একটা সুন্দর তুলনা করেছেন যা পারস্পরিক বিপরীতমুখীতাকে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলে।

"চীনের ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকতা সম্পূর্ণ আলাদা ... এর বিপ্লবী পরিবেশের উদ্ভব হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আলাদাভাবে। আমরা প্রথমেই শিল্পোন্নত এলাকায় বা বড় শহরগুলোতে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসিনি; বরঞ্চ আমরা প্রধানতঃ গ্রাম এলাকায় বিপ্লবী গণভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছি এবং ২২ বছর ধরে বিপ্লবী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। ঐ যুদ্ধের বছরগুলোতে আমাদের দেশের বিছিন্ন জাতি-গোষ্ঠী একটা নিবিড়-সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল ... আমাদের ভিতরকার সম্পর্ক এবং বহিঃবিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের প্রকৃতি অক্টোবর বিপ্লবের সময় রাশিয়া কর্তৃক গৃহীত নীতি গ্রহণে বাধ্য করেনি। রাশিয়ান নীতি গুরুত্বারোপ করেছিল জাতীয় স্বাধীকারের উপর এবং একই সময়ে সমর্থন করেছিল জাতীয় বিচ্ছিন্নতার।[২৪]

উত্তর আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ

(মার্কসীয়) মতবাদ রাষ্ট্রীয় প্রপাগাণ্ডা যন্ত্রের অধীনস্থ হওয়ার কারণে বিপ্লবোত্তর সোভিয়েক ইউনিয়নে কোন একজন চিন্তাবিদকে সুনির্দিষ্ট করা মুশকিল। তবুও, মোটামুটিভাব একটা সাধারণ ধাঁচ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে সোভিয়েত আন্তর্জাতিকতাবাদ দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়েছিল যেটা ১৯৫৩ সালে স্টালিনের মৃত্যু পর্যন্ত সোভিয়েক পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র ছিল। গোটা বিশ্ব দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত হয়েছিল ঃ সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজবাদী শিবির, আর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী শিবির। উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বাধীনতার প্রতি খুব কম নজরই দেয়া হয়েছিল। ক্রুশচেভ দ্বৈতশিবির মূলনীতিকে ভেঙে বিশ্বকে দুটো জোনে ভাগ করেছিলেন : সোভিয়েত ইউনিয়ন, সমাজবাদী এবং স্বতন্ত্রদেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত শান্তির জোন, এবং পুঁজিবাদী ও এর সহযোগী দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত যুদ্ধের জোন। এর মাধমে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির নমনীয়তা ও পরিপক্কতা এসেছিল এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার প্রতি সমন্বিত নীতি গ্রহণ করতে পেরেছিল। ব্রেজনেভ তাঁর পূর্বসূরীদের অর্জনকে আরো পাকাপোক্ত করেছিলেন। তিনি ব্রেজনেভনীতি ঘোষণার মাধ্যমে সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বলয়ের মধ্যে কারো নাক গলানোকে মোটেই সহ্য করবেন না। এ নীতি তিনি প্রথমে প্রয়োগ করেছিলেন পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলোর ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীতে (আফগানিস্তানে সামরিক আগ্রাসনের পর) এশিয়াতে প্রয়োগ করতেন।

জাতীয়তার প্রশ্নে সোভিয়েত নেতৃত্ব প্রাথমিকভাবে এ অবস্থান বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল যে তাঁরা এটার সমাধান করে ফেলেছেন। তাঁরা ১৯২০ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত আদমশুমারী থেকে নৃ-জাতিক শ্রেণীবিভাগকে বিলুপ্ত করেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৯ এবং ১৯৭০ সালে আবার যখন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তখন বাল্টিক থেকে মধ্য

এশিয়া পর্যন্ত নৃ-জাতিক গোষ্ঠীর পুনঃজাগরণ দেখে সোভিয়েত হতবাক হয়েছিল এবং রুশ ও অরুশদের সংখ্যাগত পার্থক্যের ব্যাপারে সতর্ক হয়েছিল।[২৫] ব্রেজনেভ নিজেই বলেছেন :

> ... সোভিয়েত জাতিগুলো পূর্বাপেক্ষা আরো বেশি একতাবদ্ধ হয়েছে। ... তার মানে এ নয় যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যকার সম্পর্কগত সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে গেছে। আমাদের দেশের মত একটা বহুজাতিক রাষ্ট্রের নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন বহুমাত্রার সমস্যার জন্ম দেয় যেগুলোর প্রতি দলের সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়।[২৬]

১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ষাটতম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আন্দ্রোপ্রোভ এ ব্যাপারটিকে আরো বলিষ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

> জাতীয়তার প্রশ্ন সমাধানে (সোভিয়েত) সাফল্যের মানে অবশ্যই এটা নয় যে একটা একক রাষ্ট্রের কাঠামোতে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতির বাস্তব জীবন ও কর্মকাণ্ডভিত্তিক সমস্যাবলী দূরীভূত হয়েছে। এটা বাস্তবিকই অসম্ভব যতদিন বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব এবং জাতীয় পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। আর এগুলোর অস্তিত্ব আরো দীর্ঘকাল এমনকি শ্রেণী বৈষম্য থেকেও দীর্ঘকাল থাকবে।[২৭]

পাশ্চাত্য বিশ্বে দ্বান্দিক-মার্কসীয় ধারার চিন্তাবিদগণ ইদানিং জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। এমন তিনজন চিন্তাবিদ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হবে ঃ (১) ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইন (Immanuel Wallerstein), (২) মাইকেল হেকটার (Michael Hecter) এবং (৩) টম নায়ার্ন (Tom Nairn)।

ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইন

ওয়ালারস্টেইন এর প্রধান যুক্তি হলো যে, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ উভয়ই পুঁজি গঠন প্রক্রিয়ার ভিতরে নিহিত সুপ্ত কাঠামোগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর রাজনৈতিক আদর্শবাদীতার বহিঃপ্রকাশ। বিশেষতঃ এ দুটোর উৎপত্তি অন্য দুটো শক্তির নিরবচ্ছিন্ন কাঠামোগত সাংঘর্ষিকতার কারণে : বিশ্ব অর্থনীতির একাত্মতা এবং অসংখ্য রাষ্ট্র কাঠামোতে এর বিভাজন। তিনি বলেন :

> জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ উভয়ই পুঁজিবাদী বিকাশের ঐতিহাসিক প্রবণতা থেকে জন্ম নিয়েছে। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় যারা শক্তিধর তাদের লক্ষ্য অর্জনে ঐগুলো যেমন ভূমিকা পালন করেছে ঠিক তেমনি এ বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী শক্তিগুলোর পিছনেও এরা শক্তি যুগিয়েছে। ফলশ্রুতিতে, আত্ম-পরিচয়ের উপলব্ধিতা যেটা ঐসব আদর্শিক মতবাদকে সজীব

রেখেছে সেটা মূলতঃ প্রকৃতিগত নয়; বরং এটা বিশ্বব্যবস্থা বিকাশের ধারায় বিশেষ ভূমিকা পালনকারী ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তিসমূহের সচেতন প্রভাবের ফল।[২৮]

জাতীয়তাবাদ ও সাম্যবাদ মূলতঃ প্রথাবিরোধী (Anti-Systemic) আন্দোলন। তবে প্রথাবিরোধী শক্তিগুলোর ভিতরে কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে। প্রথাবিরোধী শক্তিগুলো ঐতিহাসিকভাবে রাষ্ট্র সম্পর্কে অথবা আন্তঃরাষ্ট্র কাঠামোর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যাপারে অস্পষ্টত রয়েছে।

মার্কসবাদী চিন্তাধারার এ অস্পষ্টতাকে ওয়ালারস্টেইন সমালোচনা করেছেন। তিনি আরো দেখিয়েছেন যে, বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের প্রথম দিককার বলশেভিক লক্ষ্য "একদেশভিত্তিক সমাজতন্ত্রের" কবলে নিপতিত হয়েছে। যাই হোক, এতদ সমালোচনা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কার্ল মার্কস মোটামুটিভাবে একটা সময় কাঠামোর ধারণা দিতে পেরেছেন এবং আমরা সুদূর ভবিষ্যতে একদিন সমাজবাদী আন্তর্জাতিক সমাজের দিকে ধাবিত হব।

মাইকেল হেকটার

শিল্পভিত্তিক সমাজে জাতীয়তাবাদের শক্ত ঘাঁটি দর্শনে হেকটার বিস্মিত হয়েছিলেন।[২৯] আইরিশ, স্কটিশ এবং ওয়েলিশ জাতীয়তাবাদের উৎপত্তির পটভূমিকা বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে হেকটার তাঁর "আন্তঃউপনিবেশ" মডেল পেশ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, বহিঃদেশীয় উপনিবেশের বিকাশ "শ্রমের একটা সাংস্কৃতিক বিভাজনের সৃষ্টি করে ঃ শ্রেণী বিন্যাসের একটা পদ্ধতি যেখানে নৈর্ব্যক্তিক সাংস্কৃতিক বিভেদকে শ্রেণী বিভাজন ধারায় আরোপ করা হয়। উচ্চ মর্যাদার পেশাগুলোকে নগর সংস্কৃতির জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। আর দেশজ সংস্কৃতিগুলোকে শ্রেণী বিন্যাসের নিম্নতম স্তরে রাখা হয়।" রাজনৈতিক, সামরিক ও আইনগত ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্র প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা নিশ্চিত করে। কেন্দ্র এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পার্থক্যকে কারণগতভাবে তাদের সাংস্কৃতিক পার্থক্যগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উপর শ্রেণী সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী বিজয় সম্পর্কিত মার্কসবাদী মতবাদের ভবিষ্যৎবাণীর বিপরীতে আন্তঃউপনিবেশ মডেল মনে করে যে, বিশেষ কিছু অবস্থার আলোকে খোদ শিল্পভিত্তিক সমাজেও জাতীয়তাবাদ দৃঢ়ভাবে অবস্থান করতে পারে। হেকটার শ্রেণী বিশ্লেষণকে ব্যবহার করে দেখাতে চেয়েছেন যে, শ্রেণী সংঘবদ্ধতা বিকাশের ভিত্তি হিসেবে বস্তুগত স্বার্থের উপর সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্যতাই এর কারণ। তিনি অবশ্য একটা সার্বজনীন মতবাদ দাঁড় করাতে চেষ্টা করেননি, বরং বিশেষায়িত গবেষণার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন।

টম নায়ার্ন

টম নায়ার্ন বিশ্বাস করেন যে, জাতীয়তাবাদ বিষয়ক মতবাদ মার্কসবাদের "বিশাল ঐতিহাসিক ব্যর্থতা"রই নামান্তর।[৩০] জাতীয়তাবাদ হলো আধুনিক পুঁজিবাদী বিশ্ব ইতিহাসের বিকাশে একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং মোটামুটিভাবে মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কালভিত্তিক অন্যান্য ভবিতব্য চিন্তাধারার মত মার্কসবাদের ক্ষমতা ছিলনা এমন ব্যাপার অথবা পুঁজিবাদী ইতিহাসের সর্বশেষ কাঠামো কেমন হবে তা অনুধাবন করাও ছিল একটি বৈশিষ্ট। জাতীয়তাবাদ অপরাজিত থাকার বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করে টম বিশ্বাস করেন যে এর ফলাফল হবে ভয়াবহ ; সে ফলাফলটা হবে "মার্কসবাদ" নিজেই।

নায়ার্ন ওয়ালারস্টেইনের সঙ্গে একমত যে, জাতীয়তাবাদের মূল খুঁজতে হবে বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতির কর্মকৌশলের ভিতরে। বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের অবস্থান এর আদর্শিক ভিত্তিকে নির্ধারণ করে। তিনি তিনটা বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন ঃ (১) পুঁজিবাদের অসম উন্নয়ন (২) রাজনীতিতে সর্বসাধারণের গণ প্রবেশ, এবং (৩) সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর ভূমিকা। এ বিষয়গুলো কিছুটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

নায়ার্নের মতানুসারে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের বিশ্বাস ছিল যে, পুঁজিবাদীদের বিস্তারটা হবে সহজ ও বিপত্তিহীন (Even and Smooth)। এমনটা হলে তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হতো। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এর প্রক্রিয়াটা ছিল বেশ বন্ধুর। নায়ার্ন বলেন :

> বাস্তবক্ষেত্রের অসম বিকাশ অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রত্যন্তাঞ্চলের উপর কেন্দ্রের সাম্রাজ্যবাদকে জন্ম দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে এই প্রভূত্বের বিরুদ্ধে একের পর এক প্রত্যন্তাঞ্চালকে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বাধ্য করা হয়েছে যাতে তারা একইসাথে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং কোন প্রকারে এর মৌল শক্তিগুলোকে নিজেদের স্বার্থে কুক্ষীগত করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র একটা তীব্র আদর্শিক রাজনৈতিক মতাদর্শের সঞ্চালনের মাধ্যমে, নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে একটা কষ্টকর বাধ্যতামূলক অভিযানের মাধ্যমে : সেটা হলো ভিত্তিস্বরূপ- তাদের জাতীয়তাকে ব্যবহার করে।

রাজনীতিতে মানুষের গণদীক্ষা শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছে জাতীয়তাবাদ প্রয়োগের ধারায়। নব্য মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সমাজকে "জনগণকে আহবান করতে হয়েছে ইতিহাস সৃষ্টির দিকে এবং আহবানের ভাষা তাদের বোধগম্য ভাষায়ই ছিল।"

> পুঁজিবাদের বিস্তারপথে এর পারিপার্শ্বিক প্রাচীন সামাজিক গঠনকে চুরমার করে দিয়েছে, আর এগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ ফাটল রেখা বরাবর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এটা একটা প্রাথমিক প্রতিপাদ্য বিষয় যে, ভাঙনের এ সকল ফাটলরেখাগুলো প্রায় সর্বদাই জাতীয়তার ক্ষেত্রে একইভাবে কার্যকর হয়েছে (যদিও কিছু পরিচিত ক্ষেত্রে গভীরে গ্রোথিত ধর্মীয় বিভাজন এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে)। তারা কখনো সম-শ্রেণীর ছিল না ...। গণসঞ্চালনের মাধ্যম হিসেবে

> জাতীয়তাবাদ ছিল অপরিণত (অথবা নিতান্তই প্রাথমিক পর্যায়ের) শ্রেণী চেতনাবোধ থেকে অধিকতর উচচমাত্রার কার্যক্ষম শক্তি।[৩২]

সুতরাং, কার্লমার্কসের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর উদ্ভব হওয়ার কোন সুযোগই ছিল না।

সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

জাতীয়তাবাদ ... সত্যিকারভাবেই গণমানুষকে এমন একটা কিছু দিতে সক্ষম হয়েছিল যেটা সত্যিই বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ ... যেটা শ্রেণী চেতনাবোধ কখনো দিতে পারেনি। জাতীয়তাবাদ হলো এমন একটা সংস্কৃতির যেটা, যতই নিন্দনীয় হোক না কেন, এটা ছিল ব্যাপকতর, অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং আলোকিত (Enlightenment) বুদ্ধিবৃত্তিবাদ অপেক্ষা মানুষের জীবন বাস্তবতার সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ। এটা যদি হয় তবে জাতীয়তাবাদ একটা অলীক চেতনাবোধ এ ধারণা সত্য হতে পারে না। আধুনিকতার বিকাশে এর অবশ্যই কার্যকারিতা ছিল, এবং সম্ভবতঃ এর গুরুত্ব ছিল শ্রেণী চেতনাবোধ থেকেও বেশি।[৩৩]

মূল্যায়ণ

মার্কস এবং এঙ্গেলস স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, ইতিহাস পুঁজিবাদী জাতি-রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে আন্তর্জাতিক সমাজবাদী সমাজে উত্তরণ করবে। সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদ উদ্ভাবনে তারা জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করেছিলেন একটা ঐতিহাসিক ধ্রুবসত্য এবং অত্যাবশকীয় ধাপও। জাতীয় পর্যায়ে জাতীয়তাবাদের একীভূতকরণের সুপ্ত ক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর খণ্ড-বিখণ্ডতার সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁরা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তাঁরা এটাকে সাম্যবাদী আন্দোলনের পক্ষে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, সমাজবাদের অধীনে একদিন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবশ্যই একীভূতকরণ সম্পন্ন হবে।

লেনিন এ ব্যাপারে তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করেছিলেন। জাতীয়তাবাদের ব্যবহার উপযোগিতা সম্পর্কে তিনি তাঁর সমসাময়িক চিন্তাবিদ থেকে আরো গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন যে, বর্জুয়া এবং সাম্যবাদী উভয়দলই জাতীয়তাবাদী শ্লোগানকে সদ্ব্যবহার করতে পারে। তাই আন্তর্জাতিকতাবাদের পাশাপাশি একই সময়ে স্বাধীকারের প্রতি তাঁর সমর্থনটা ছিল সত্যিই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মতামত। তিনি জানতেন কিভাবে নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদ কিংবা নির্ভেজাল আন্তর্জাতিকতাবাদ সাম্রাজ্যবাদের গোড়াপত্তনে সক্ষম। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর মধ্যে একটা মিত্রতা স্থাপনের ব্যাপারে তিনি খুব আশাবাদী ছিলেন।

'একদেশভিত্তিক সমাজবাদ' এ মতামতের উপর ভিত্তি করে স্টালিন লেনিনের মতামতকে পুনঃব্যক্ত করেছেন। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী উদ্দেশ্যকে পিছনে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে। বৃহৎ রাশিয়ান জাতীয়তাবাদ যাকে লেনিন সমালোচনা করেছিলেন স্টালিনের লেখায় তার কোন স্থান ছিল না। জাতীয়তার প্রশ্নে মাও এর অবস্থান অনেকটা স্টালিন এর কাছাকাছি ছিল।

স্বাধীকারের আবিষ্কারকে পার্টি-শ্লোগান হিসেবে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে চায়নিজ কম্যুনিষ্ট পার্টি শুধুমাত্র লং মার্চ এর সময় সংখ্যালঘুদের সমর্থন আদায়ের চাতুর্যপূর্ণ চাল ছাড়া কখনো এর উপর গুরুত্বারোপ করেনি। ক্ষমতায় আরোহণের পর চায়নিজ জাতীয়তাবাদ পুরোমাত্রায় গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

উত্তরাধুনিকায়ন ধারা বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে, সোভিয়েত আন্তর্জাতিকতাবাদের রাষ্ট্রীয় মতামত হলো অর্জিত ফলাফলকে আদর্শিক শক্তিতে পরিণত করার চেয়ে একে পাকাপোক্ত করতে বেশি মনোযোগী হওয়া। মূল্যবোধ থেকে পেশী শক্তিতে রূপান্তর, যেটা স্টালিনের লেখাতে ফুঠে উঠেছে, সেটা মতাদর্শিক অবস্থানকে বর্জনের প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন। অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে বাল্টিক থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত জাতীয়তার প্রশ্নটার প্রাদুর্ভাব সর্বোচ্চ-নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নতুন করে চিন্তা করতে বাধ্য করেছিল। রাষ্ট্রীয় ঘোষণা কিংবা প্রচারণায় আন্তর্জাতিকতাবাদের উচ্ছ্বাসটা একেবারে উবে গেল। বরং নেতৃত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়কে জাতীয়তার বিচ্ছিন্নতা তাড়া করে ফিরছিল।

পাশ্চাত্যের দ্বান্দিক-মার্কসবাদীরা একটা উভয় সংকটের মুখে পড়েছিল ঃ সেটা হলো জাতীয়তাবাদ আপন শক্তিতে বিদ্যমান শুধু নয় বরং আরো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং সমাজবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য, যাতে মার্কস ও লেনিন বিশ্বাস করতেন, সেটা দৃষ্টি সীমানায় কোথাও দেখা যাচ্ছিল না-এ দুয়ের মাঝামাঝি পুরো মতবাদটাকে বাঁচিয়ে রাখা। শুধুমাত্র দুটো বিকল্প তাঁদের সম্মুখে খোলা ছিল। প্রথমতঃ এটা জোর দিয়ে দাবি করা যে, মার্কসবাদের মৌলিক ভিত্তিটা এখনো যুক্তিসিদ্ধ, তবে এর মূল প্রবক্তারা সময় কাঠামো সম্পর্কে খুব সংকীর্ণভাবে চিন্তা করেছি। দ্বিতীয়তঃ এটা স্বীকার করা যে, এর প্রতিষ্ঠাতা চিন্তাবিদরা সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোকে কম গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তাই এ মতবাদকে পুনঃগঠন করতে হবে। এভাবে দুটো বিকল্প পন্থাই ব্যবহার করা হয়েছে।

ওয়ালারস্টেইন বিশ্বাস করেন যে, মার্কসবাদের মৌলিক তত্ত্বগুলো এখনো সঠিক তবে এর বাস্তবায়নে মার্কস ও লেনিন যে সময়ের কল্পনা করেছিলেন তার থেকে আরো অনেক অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে। অপরদিকে অন্যান্যদের ন্যায় হেকটার ও নায়ার্ন বিশ্বাস করেন যে, এ মতবাদকে অবশ্য পরিমার্জন করতে হবে।

পাশ্চাত্যের মার্কসবাদী চিন্তাবিদগণ মার্কসবাদকে আরো ব্যাপকতর আওতায় পুনঃগঠন করতে শুরু করেছেন। তবে যে প্রশ্নটা অবশ্যই এক্ষেত্রে করতে হয় সেটা হলো ঃ মার্কসবাদের প্রতিফলন হতে পারে এমন কতটুকইবা আর বেঁচে আছে? জাতীয়তাবাদ বিশ্লেষণে মার্কসবাদের সক্ষমতাকে তো টম নায়ার্ন প্রায় অস্বীকার করার পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। সাংস্কৃতিক উপাদান এবং শ্রেণীর উপরে জাতীয় গুরুত্বকে জোর দেয়ার কারণে নায়ার্ন ঐ সকল জাতীয়তাবাদী সমাজবাদীদের কাতারে এসে পড়েন যাঁদেরকে লেনিন ও স্টালিন তীব্র সমালোচনা করেছেন। এটা কি একটা চিন্তা-পরিগম্ভীর পরিবর্তন (Paradigm Shift)? এ মুহূর্তে এ প্রশ্নের যে কোন উত্তরই হবে অপরিপক্ক।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলাম

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিভিন্ন মুসলিম দেশের কয়েকজন ইসলামী চিন্তাবিদ আধুনিকতার আলোকে ইসলামের পুনঃব্যাখ্যা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সময়ের প্রখ্যাত চিন্তাবিদগণ হলেন মিশরের মুস্তাফা কামাল, মুহাম্মদ আব্দুহ এবং রাশিদ রিদা, ইরানের জামালুদ্দীন আফগানী, আফগানিস্তানের মাহমুদ তারাজী, তুরস্কের জিয়া গোকাল্প, এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের স্যার সায়্যেদ আহমদ খান, মুহাম্মদ ইকবাল ও সায়্যেদ আমির আলী। প্রায় সবগুলো মুসলিম দেশে উপনিবেশিক শাসন থাকাতে সেখানে উদার সাংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এ সময়ে ইসলামী চিন্তাধারার উপর পশ্চিমা উদারপন্থী চিন্তাধারার প্রভাব সম্পর্কে আলবার্ট হোরানী (Albert Hourani) খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন :

... (ইসলামী চিন্তার) এ পুনর্জাগরণ ইউরোপীয় উদার চিন্তাধারার অনুপ্রেরণায় সংঘটিত হয়েছিল, এবং তৎকালীন সময়ের ইউরোপীয় চিন্তাধারার মৌলিক নীতিগুলোর আলোকে ইসলামী ধ্যান-ধারণাগুলোর পর্যায়ক্রমিক পুনঃব্যাখ্যার দিকে অগ্রসর হয়। ইবনে খালদুনের 'উমরান' পর্যায়ক্রমে গিজট (Guizot) এর 'সভ্যতা'য় রূপান্তর হলো; তদরূপে মালেকী মাযহাব ও ইবনে তাইমিয়ার মাসলাহা জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এর ইউটিলিটিতে (উপযোগ) মিলে গেল, ইসলামী আইনের ইজমা গণতন্ত্রের জনগণের মতামত এবং আহল আল-হাল ওয়া আল-আকদ হলো পার্লামেন্ট মেম্বার।[১]

এখানে আলোচনার জন্য আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের চিন্তাবিদগণের মধ্য থেকে মুহাম্মদ ইকবালকে নির্বাচন করেছি। কারণ হলো তাঁর চিন্তা-চেতনার মৌলিকতা এবং ইসলামী চিন্তাধারায় জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রশ্নে অন্যান্য চিন্তাবিদগণের উপর তাঁর ব্যাপক প্রভাব ছিল। তাঁকে সত্যিকারার্থে বলা যায় যে, তিনি সমসাময়িক ইসলামী পুনঃজাগরণের অগ্রদূত।

ঐতিহ্যবাদী চিন্তাবিদগণ

মুহাম্মদ ইকবাল

মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) ছিলেন প্রথম আধুনিক মুসলিম দার্শনিক যিনি ইসলামের আন্তর্জাতিক মতাদর্শকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ নাগাদ তুলে ধরেছিলেন।[২] তাঁর প্যান-ইসলামিক ধারণাটা বৃহৎভাবে তৎপূর্বের আরেকজন মুসলিম দার্শনিক জামালুদ্দীন আল আফগানীর (১৮৩৮-১৮৯৭) দ্বারা প্রভাবিত ছিল।[৩] জামালুদ্দীন আল আফগানী

ছিলেন "সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একজন প্রথম সারির গুরু ও প্রবর্তক ... পাশ্চাত্য বিরোধী ঐক্য শক্তি এবং সংস্কারক।"[৪] তার মতাদর্শ ছিল প্যান-ইসলামিক। তিনি প্রচার করতেন যে, মুসলমানদের উচিৎ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে জাতীয়তাবাদ ও প্যান-ইসলামীবাদকে গ্রহণ করতে হবে।

ইকবাল উদারপন্থা ও মার্কসবাদের কিছু ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করতেন, তবে তিনি উভয় মতাদর্শের তীব্র সমালোচক ছিলেন। তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক প্রগতি এবং পাশ্চাত্য উদারপন্থাবাদের গতিশীলতাকে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তিনি পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে সমালোচনা করেছেন এ বলে যে, এটা আসলে কিছু সুবিধাভোগী সংখ্যালঘু শ্রেণীর রাজনীতিতে আধিপত্যময় অংশগ্রহণ বৈ কিছু নয়, এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয়ক্ষেত্রেই চরম অবিচারের শামিল, আর এর জাতীয়তাবাদ অভ্যন্তরীণভাবে বর্ণবাদ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে ইকবাল সমাজবাদের কিছু ভালো দিকেরও প্রশংসা করেছেন। যেমন অর্থনৈতিক সমতা ও গণ-অংশগ্রহণের উপর এর গুরুত্বারোপ করা এবং পুঁজিবাদকে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত করা। তবে তিনি এ মতবাদের নাস্তিকতা, এর ব্যক্তি মূল্যের উপেক্ষা এবং বিশেষ শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রকে সমালোচনা করেছেন। তাঁর সর্বশেষ মতামত ছিল যে, পুঁজিবাদ কিংবা সমাজবাদ কোনটাই দিশেহারা মানবতার মুক্তি আনতে সক্ষম নয়।

তাঁর মতে, প্যান-ইসলামবাদ হলো বিশ্ব মানবতাবাদ। ইসলামের বাণী হলো বিশ্বজনীন এবং এটা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রণীত হয়েছে। তাঁর মতে, ইসলামের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী দুটো মৌলিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত: (ক) তাওহীদ বা খোদার একত্বতা এবং (২) মানুষ হলো পৃথিবীতে খোদার প্রতিনিধি এবং বিশেষ জিম্মাদার। ইসলাম মানুষকে সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে তুলে দেয় এবং বিশ্বাসীদের একটা সংঘবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলে। তাঁর ভাষায়–

> ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো এটা সকল প্রকার ভৌগলিক সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। এবং এর উদ্দেশ্য হলো বিশ্ব মানবতাকে একটা চূড়ান্ত এককে পরিণত করার একটা রূপরেখা উপহার দেয়া। এটা পারস্পরিক সাংঘর্ষিক বর্ণ-গোত্র থেকে এর অনুসারী তৈরি করে এবং এটিকে সামগ্রিক একটা জনসমষ্টিতে রূপান্তর করে যে জনসমষ্টি তাদের স্ব-স্ব আত্ম-চেতনতা বহন করে।[৫]

এটা উল্লেখ্য যে, যদিও ইকবালের যুক্তি হলো ইসলামের সাম্যবাদী ধারণার আদলে উপস্থাপন করা, এর উদ্দেশ্য হলো সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে নিয়ে একটা বিশ্বজনীন সমাজ গঠন করা, এর লক্ষ্য হলো জাতীয়তার বিভিন্নতা এবং স্বকীয়তা সত্ত্বেও সমগ্র মানবতাকে একত্রিত ও সংগঠিত করা।[৬] "মক্কা ও জেনেভা" নামের একটা কবিতায় তিনি 'লীগ ও নেশনস' এর কার্যকারিতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন এ যুক্তিতে যে, এটার ভিত্তি হলো জাতিসমূহকে একতাবদ্ধ করা, বিশ্বমানবতা নয়। জাতীয় কোন্দল দ্বারা বিভাজিত

পৃথিবীর প্রতি মক্কার বার্তা হলো যে, বিশ্ব মানবতাকে একতাবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে এমনতর সমস্যাকে চুরমার করে দেয়া। তিনি মন্তব্য করেন–

> জাতিসমূহের সংঘবদ্ধতা আজকাল একটা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু মানবতার একতাবদ্ধতা এখনো লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছে। মানব সমাজের বিশৃঙ্খলাই হলো Frankish Statemenship-এর উদ্দেশ্য। ইসলামের উদ্দেশ্য হলো মানবতার একাতত্মা, মক্কানগরী-জেনেভাকে যে বার্তাটি দিতে চায় সেটা হলো- জাতিসংঘ (League of Nations) নাকি মানবতার সংঘ?

ইকবাল দেখতে পেয়েছিলেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা মুসলিম বিশ্বের উপর একটা অন্যায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিচ্ছে। তাই তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন যে, ইসলামী ধর্ম বিশ্বাস সুবিচার ভিত্তিক একটা বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম। তিনি বলেন–

> পাশ্চাত্য যে শোষণময় অর্থনীতির জন্ম দিয়েছে এবং প্রাচ্যের দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দিয়েছে এর বিরুদ্ধে এশিয়ার জনগণ অবশ্যই রুখে দাঁড়াবে ... তোমরা যে ধর্মবিশ্বাসের ধারক সেটা ব্যক্তি-মূল্যকে স্বীকার করে, এবং তার সবকিছু খোদা ও মানুষের জন্য বিলিয়ে দিতে শিক্ষা দেয়। এর ভবিষ্যত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। এটা এখনো একটা বিশ্ব ব্যবস্থার জন্ম দিতে পারে যেখানে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান তার গোত্র, বর্ণ কিংবা তার আয়ের উপর নির্ভর করে নির্ধারণ হয় না। বরং এটা নির্ধারিত হয় তার জীবন-যাপনের গুণগত মানের ভিত্তিতে যেখানে গরীবেরা ধনীদের উপর গুরুত্বারোপ করে ... যেখানে একজন অচ্ছুৎ একজন রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে পারে; যেখানে ব্যক্তি মালিকানাকে আমানত হিসেবে গণ্য করা হয় এবং যেখানে এমনভাবে সম্পদ উপার্জনকে গ্রহণ করা হয় না যাতে সম্পদের মূল উৎপাদনের উপর কর্তত্ব করা হয়। তোমাদের ধর্ম বিশ্বাসের এ অসাধারণ আদর্শটাকে অবশ্যই মধ্যযুগীয় ধর্মবেত্তা ও আইনবিদদের রূপ-কল্প থেকে মুক্ত হতে হবে।[৮]

তাঁর মতে আজকের জাতীয়তাবাদ হলো উদারবাদের একটা প্রাপ্তি। এটা একটা বহিরাগত ধারণা এবং ধর্ম বিরোধী হওয়ার কারণে তিনি এটাকে বর্জন করেন। ইকবালের মতে পশ্চিমা বিশ্বের জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয় খৃষ্টধর্মের বিশেষ ধর্মতত্ত্বের কারণে যেটা শুধুমাত্র পরকালভিত্তিক, পার্থিব জীবনের প্রতি নেতিবাচক এবং আত্মা ও বস্তুর দ্বৈততা সম্পর্কিত।[৯] জাতীয়তাবাদ হলো কিছু স্থানীয় প্রতীকের এক প্রকার উপাসনা যেটা ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং ফলশ্রুতিতে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যকার বিচ্ছেদের কারণে পাশ্চাত্য বিশ্বে ব্যাপক প্রভাবশালী হয়ে উঠে। নব্য মতবাদের অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদ ধর্মের স্থান দখল করে নেয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য জাতীয়তাবাদ একটা মারাত্মক দুর্যোগ বলে ইকবাল মনে করেন। একটা জাতির সফলতার গর্ব অত্যাবশকীয়ভাবে অন্য একটা জাতির উপর সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ ও এর শোষণে উদ্বুদ্ধ। এটা জাতীয় বৈরিতা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুদ্ধ এবং মানব দৃষ্টিভঙ্গি ও পারস্পরিক

সহানুভূতির সংকীর্ণতার দিকে ঠেলে দেয়। সর্বোপরি এটা বিশ্ব মানবতাকে ধ্বংস করে। তিনি মুসলিম জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন এ বলে :

> উদারবাদে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির উপাদান রয়েছে, এবং আধুনিক ইসলামী চিন্তায় এটা যেভাবে অভূতপূর্ব শক্তি নিয়ে প্রভাব বিস্তার করছে তাতে মনে হয় অবধারিতভাবে বিশ্ব-মানব দৃষ্টিভঙ্গী যেটা মুসলিমরা তাদের ধর্ম থেকে আহরণ করেছে সেটা পুরোপুরিভাবে মুছে যাবে।[১০]

ইকবাল মুসলমানদের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, নৃ-জাতিক, বর্ণ এবং ভৌগলিক-সীমানাগত পার্থক্যের উপযোগিতা সীমাবদ্ধ এবং ইসলামে এটাকে শুধুমাত্র আত্ম-পরিচয় দানের বাহক হিসেবে গণ্য করা হয়। ইসলাম কোন জাতীয়তাবাদও নয়, কিংবা সাম্রাজ্যবাদও নয় বরং এটা একটা কম্যুনিটি, এটা "জাতিসংঘ" যেখানে কৃত্রিম জাতীয় সমস্যা এবং বর্ণগত বিভিন্নতা কেবলমাত্র ভিন্নতার নির্দেশক হিসেবে গণ্য করা হয়, মানুষের সামাজিক সীমানাকে সীমিত করার জন্য নয়। নিম্নোক্ত ভাষায় ইকবাল জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> (জাতীয়তাবাদের) নতুন উপাস্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মহান হলো জন্মভূমি- যে উপাস্যের পোষাক হলো ধর্মের কফিন। জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতার মূল হলো এটা। বাণিজ্যের মাধ্যমে জাতিগুলোকে দাসত্বে পরিণত করা এটারই কারণে। রাজনীতি যদি সততাবর্জিত হয়, তবে সেটার কারণেই, যদি দুর্বলের ঘর ধ্বংস হয় তবে এটার কারণেই; এটাই সেটা যেটা খোদার সৃষ্টিকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করে, এটাই সেটা যেটা ইসলামের জাতীয়তার মূলে আঘাত করে।[১১]

ইকবাল শুধু নামমাত্র একজন আদর্শবাদী ছিলেন না। তিনি জানতেন সে জাতীয়তাবাদ হলো একটা দ্বিমুখী অস্ত্র যেটাকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতেও ব্যবহার করা যায়। তিনি ইসলামী জাতীয়তাবাদের ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বব্যাপী একটা একক মুসলিম সমাজ গঠনের লক্ষ্যে। মুসলিম জাতীয়তাবাদকে তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় সংজ্ঞায়িত করেন :

> আমাদের জাতীয়তার মৌলিক নীতি ভাষা কিংবা দেশের অবিভাজ্যতা কিংবা অর্থনৈতিক স্বার্থের সামঞ্জস্যতা নয়। এর কারণ হলো আমরা সবাই একটা বিশেষ বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী ধারণ করি ... যে আমরা ইসলামের রাসূল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটা সমাজের সদস্য। ইসলাম সকল বস্তুগত সীমাবদ্ধতাকে ঘৃণা করে এবং এর জাতীয়তাকে একটা নির্ভেজাল Abstract idea যেটা প্রকৃতিগতভাবে বাস্তব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিস্তারমান শ্রেণীতে রূপ নিতে পারে। কোন একটা নির্দিষ্ট জাতির মেধা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর এর জীবনী শক্তির নীতিমালা নির্ভর করে না। মৌলিকভাবে, এটা হলো সর্বকালীন এবং সর্বব্যাপী।[১২]

আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ

দুটো বিশেষ কারণে আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণের মধ্য থেকে কোন একজনকে বেছে নেয়া দূরূহ ঃ (ক) মুসলিম বিশ্বব্যাপী সাম্প্রতিক সময়ে (১৯১৯-১৯৭১) নেতৃত্ব এবং বুদ্ধিজীবী পর্যায়ে মতামত ও চিন্তার ক্ষেত্রের অভাবনীয় রকমের মিল রয়েছে। (খ) তাঁদের ধ্যান-ধারণায় মৌলিকতা খুবই অল্প। তারা হয়তো উদার জাতীয়তাবাদী কিংবা জাতীয় সমাজবাদীদের থেকে কিছু ধারণা গ্রহণ করে এবং সেটাকে অতীতে গ্রোথিত জাতিগত (Ethnic) সংস্কৃতির সাথে একত্র করে। তাদেরকে প্রাথমিকভাবে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় :

১. পাশ্চাত্য ধাঁচের উদার জাতীয়তাবাদী যেমন কামাল আতা তুর্ক (তুরস্ক), ইরানের শাহ (ইরান), রাজা আমানুল্লাহ (আফগানিস্তান), আইয়ুব খান (পাকিস্তান), জাফর আল-নুমাইরী (সুদান), আনোয়ার আল-সাদাত (মিশর), সুহার্তো (ইন্দোনেশিয়া), রাজা হুসেইন (জর্দান)।

২. জাতীয় সমাজবাদী ধাঁচের যেমন জামাল আব্দুল নাসের (মিশর), হাফিজ আল আসাদ (সিরিয়া), সাদ্দাম হোসাইন (ইরাক), জুলফিকার আলী ভুট্টো (পাকিস্তান), সরদার দাউদ খাঁন (আফগানিস্তান)।

উপরোক্ত নেতৃবৃন্দের লেখায় নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী ফুটে ওঠে :

১. তাঁরা সবাই জাতীয়তাবাদী। তাঁদের কেউ কেউ আন্তর্জাতিকাবাদ যেমন আন্ত-আরববাদ, ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদ বা তৃতীয় বিশ্ব আন্তর্জাতিকতাবাদের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন, কিন্তু তাঁরা প্রাথমিকভাবে তাঁদের দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বাস্তবতা বা তাঁদের দেশের বিদেশী নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন।

২. তাঁদের মতাদর্শগুলো ছিল বিভিন্ন মতবাদের সংমিশ্রণে। তাঁরা উদার কিংবা সমাজবাদী জাতীয়তাবাদকে নৃ-তাত্ত্বিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সবক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য ছিল আধুনিকায়ন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে আধুনিকায়ন হলো মূল্যবোধ বিমুক্ত প্রক্রিয়া এবং তাঁরা মতাদর্শকে বাদ দিয়েই টেকনোলজি ধার বা গ্রহণ করতে পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শ ছিল পশ্চিমা বিশ্ব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

৩. প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের মতাদর্শ গঠনে ইসলামকে একটা অংশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। ইসলামের উপর গুরুত্বারোপটা দেশ কিংবা ঐতিহাসিক সময়কাল ভেদে বিভিন্ন ছিল কিন্তু ধর্ম হিসাবে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বৈরিতা প্রায় ছিলই না। কর্তৃত্বের বৈধতার প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়াতে তাঁদের অধিকাংশই ইসলামকে ব্যবহার করেছেন এবং ইসলামকে তাদের ভাষানুযায়ী ব্যাখ্যা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

আমরা আমাদের আলোচনাকে শুধুমাত্র দুইজন নেতার মতাদর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব যারা, আদর্শগতভাবে পাশ্চাত্য উদার এবং জাতীয় সমাজবাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন, তাঁরা হলেন : যথাক্রমে- মোহাম্মদ আইয়ুব খান, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট (১৯৫৮-১৯৬৯) এবং জামাল আব্দুল নাসের, মিশরের প্রেসিডেন্ট (১৯৫৪-১৯৭০)।

মুহাম্মদ আইয়ুব খান

মুহাম্মদ আইয়ুব খান ছিলেন পাশ্চাত্য উদার ধাঁচে জাতি গঠনে একজন আদর্শ নেতা।[১৩] তিনি বিশ্বাস করতেন যে, "শিক্ষিত সমাজের ভাষায় যেটা বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, বিশ্ব ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি জাতীয়তাবাদের ভাষা, ইসলামের আদর্শকে সে ভাষায় প্রকাশ ও পালন করাই" যথেষ্ট। তাঁর মতে, পাকিস্তানের কর্তৃত্ব সেক্যুলার উদার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের হাতে, তাই ইসলামীদের জন্য দাবি করার কিছুই ছিল না। তাঁর মতে, "পাকিস্তানীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের তীব্র অনুভূতি ছিল না।" পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য হলো "একটা শক্তিশালী, সংঘবদ্ধ জাতি যেটা বিশ্ব ইতিহাসে তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে।"

তাঁর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী প্রাথমিকভাবে সীমিত ছিল আন্তঃএশীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যাতে পাকিস্তানের একটা সুস্পষ্ট ভূমিকা থাকবে। তিনি লিখেছেন :

> আমি সমস্যাবলীকে পর্যবেক্ষণ করেছি একজন পাকিস্তানী, একজন মুসলিম ও একজন এশীয় হিসাবে। বিশ্ব সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আমি সমস্যাগুলোকে একজন এশীয় হিসেবে দেখেছি। এশীয় কম্যুনিটির ভিতরে থেকেই আমাদের জন্য একটা স্থায়ী সম্মানজনক ও শক্তিশালী স্থান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই আমাদের জাতীয় স্বার্থ দাবি করে। এবং এ লক্ষ্যেই আমরা বিশেষ এ অংশে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।"[১৪]

পাশ্চাত্য ধাঁচে আধুনিকায়নে তাঁর বিশ্বাস ছিল প্রচণ্ড। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এটা জাতি রাষ্ট্রকে বৃহত্তর সুসংঘবদ্ধ করতে সাহায্য করবে। তাঁর মতে আধুনিক ভৌত অবকাঠামো গঠন যেমন রাস্তার উন্নয়ন, শিক্ষার বিস্তার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিশেষে একটা দেশপ্রেমিক মধ্যবিত্ত সমাজের জন্ম দেবে যেটা পাশ্চাত্য ধাঁচের জাতি রাষ্ট্র গঠন করবে।

জামাল আব্দুল নাসের

জামাল আব্দুল নাসের আধুনিক ধাঁচে মিশরে একটা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।[১৫] তিনি ফিরাউনদের যুগ থেকে শুরু করে ইসলামের বিজয় পর্যন্ত মিশরের ইতিহাসকে পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ওসমানীয়, বৃটিশ এবং অন্যান্য বিদেশী শক্তি যাদেরকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী বলে মনে করতেন তাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকে তিনি প্রশংসা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মিশরে রাজনৈতিক এবং সামাজিক উভয় ধরণের বিপ্লবের দরকার রয়েছে। তিনি বলেন :

> দুনিয়ার সবাই দুটো বিপ্লবের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়-একটা হলো রাজনৈতিক বিপ্লব যেটা তাদেরকে তাদের উপর জেঁকে বসা একজন রাজনৈতিক শাসকের হাত থেকে তাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে ফিরিয়ে দেবে; অথবা বিজাতীয় সামরিক শক্তি যেটা তাদের জন্মভূমিতে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের আধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্ত করবে; এবং দ্বিতীয়টা হলো একটা সামাজিক বিপ্লব যা হলো একটা শ্রেণী সংগ্রাম যেটা পরিশেষে দেশের সকল জনগণের জন্য সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবে ... আমরা উভয় বিপ্লবের যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছি।[১৬]

তাঁর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী তিনটা বৃত্ত-বিশিষ্ট ঃ আরব বৃত্ত, আফ্রিকান বৃত্ত এবং মুসলিম বিশ্ব বৃত্ত। তিনি বলেন :

> আমরা বোকার মত এমন একটা বিশ্ব মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারিনা যেখানে আমাদের কোন স্থান নেই, আর সমমর্যাদাসম্পন্ন ভূমিকা পালন করার দায়িত্বও দেয়া হয়নি। আমরা এটাও অস্বীকার করতে পারিনা যে, আমরা একটা আরব বৃত্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত যেটা ঠিক তেমনিভাবে আমাদের একটা অংশ যেমননিভাবে আমরা তার একটা অংশ। আমাদের ইতিহাস এটার সাথে মিশে গিয়েছে, আর এর ভালমন্দ আমাদের সাথে সম্পৃক্ত।
>
> ... আফ্রিকা নামে একটা মহাদেশ আছে ভাগ্য আমাদেরকে যেটাতে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং যেটা আজ এর একটা ভবিষ্যত দিনের জন্য তীব্র সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করার জন্য বাধ্য হয়েছে। আমরা চাই বা না চাই-এ সংগ্রাম আমাদের উপর প্রভাব ফেলে। আমরা কি এটা অগ্রাহ্য করতে পারি যে একটা মুসলিম বিশ্ব আছে যেটার সাথে আমরা কেবলমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের বন্ধনেই নই বরং ঐতিহাসিক সভ্যতার দ্বারা আবদ্ধ?

তাঁর স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র উভয় নীতিই মূলতঃ জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষাপট থেকে গৃহীত যেটাতে ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদের কোন সামান্যতম গন্ধও ছিল না, বরং এটাকে তুলনামূলকভাবে একটা কম গুরুত্বসম্পন্ন বৃত্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

উত্তর আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ

আমরা এখানে ইসলামের জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ বিষয়ে তিনজন লেখকের মতামতকে পেশ করবো : (১) ইমাম খোমেনী (ইরান), (২) সায়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (পাকিস্তান) এবং (৩) সায়্যেদ কুতুব (মিশর)। প্রথমেই এটা পরিষ্কার করে নেয়া ভালো যে, এ সকল লেখকদের কোন লেখাতে জাতীয়তাবাদ বিষয়ে কোন বিস্তারিত

আলোচনা পাওয়া যাবে না। এটার কারণ হলো প্রাথমিকভাবে তাঁরা আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবিভাজ্যতায় বিশ্বাসী।

ইমাম খোমেনী

খোমেনী স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।[১৮] তিনি স্বদেশপ্রেমকে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদকে বর্জন করেছেন দুটো কারণে (ক) এটা ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীত এবং (খ) এটা একটা বিজাতীয় ধারণা যেটা মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করার জন্য বিদেশীরা প্রচার করেছে। তিনি বলেছেন :

> একজনের পিতৃভূমি এবং জনগণকে ভালোবাসা এবং এর সীমানার নিরাপত্তা সংরক্ষণ করা উভয়ই অনাপত্তিকর, কিন্তু জাতীয়তাবাদ যেটা অন্য মুসলিম জাতির প্রতি বৈরিতার সঙ্গে জড়িত সেটা সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন বিষয়। এটা মহাগ্রন্থ কুরআনের এবং মহান রাসূলের আদেশের পরিপন্থী। জাতীয়তাবাদ যেটা মুসলিমদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং মুসলিম বিশ্বাসীদের মর্যাদায় ফাটল ধরায় সেটা ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থের বিরুদ্ধে। জাতীয়তাবাদ হলো বিদেশীদের দ্বারা গৃহীত একটা কৌশল যারা ইসলামের প্রসারকে সহ্য করতে পারে না।[১৯]

তিনি অভিযোগ করে বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে ফেলেছে, তাই তিনি মুসলিমদের প্রতি আবেদন করেছেন বর্তমানের জাতিরাষ্ট্রকে উৎখাত করতে :

> তারা ইসলামী উম্মাহর বিভিন্ন অংশকে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং আলাদা আলাদা কৃত্রিম জাতির জন্ম দিয়েছে ... মুসলিম উম্মাহর স্বাধীনতা ও অবিভাজ্যতা অর্জন করতে আমাদেরকে অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নিপীড়ক সরকারগুলোকে উৎখাত করতে হবে এবং তদস্থলে ইনসাফভিত্তিক ইসলামী সরকার প্রবর্তন করতে হবে যেটা জনগণের খেদমতে নিয়োজিত থাকবে।[২০]

তিনি সাম্রাজ্যবাদীদেরকে দায়ী করেছেন একটা অন্যায্য ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার জন্য:

> ... সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের উপর একটা অন্যায্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে আমাদের জনগণকে দু'ভাগে ভাগ করেছে ঃ নিপীড়ক ও নির্যাতিত। কোটি কোটি মুসলমান ক্ষুধার্ত এবং সকল প্রকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত, অথচ গুটিকতক ধনী ও ক্ষমতাশালী শ্রেণী বিলাসী ও দুর্নীতির জীবন-যাপন করে। ক্ষুধার্ত ও বঞ্চিত জনগণ নিপীড়নকারীদের নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে এসেছে এবং তারা আজও সংগ্রাম করে যাচ্ছে।[২১]

ইসলাম হলো 'সত্য এবং সুবিচার'-এর ধর্ম। এটা তাদের ধর্ম যারা স্বাধীন ও মুক্ত হতে চায়। যারা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এটা তাদের পাঠশালা।

ইসলাম হলো একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং মানব জীবনের এমন কোন ক্ষুদ্র বিষয় নেই যে ব্যাপারে ইসলাম প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়নি এবং মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করেনি। ইসলামী সরকার বলতে বুঝানো যেতে পারে "মানুষের উপর ঐশী আইনের শাসন।" বেলায়েত-ই-ফকীহ (আইনজ্ঞদের শাসন) মূলনীতির অস্পষ্টতা স্বীকার করে নিয়ে তিনি মনে করেন যে, ইসলামের প্রদত্ত বিস্তারিত নির্দেশনা ও রাসূল (সঃ) এর বাস্তব জীবনের উদাহরণ এটাই প্রমাণ করে যে, ধর্মবিশেষজ্ঞদের শাসন হলো স্বপ্রমাণিতভাবে যৌক্তিক। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন:

> ... ফকীহগণ হলেন প্রকৃত শাসক এবং শাসনকার্য অবশ্য তাঁদের জন্যই মানায়; যারা আইন বিষয়ে অজ্ঞ হওয়ার কারণে ফকীহদের নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য তাদের জন্য নয়।[২২]

শাহ'এর রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে খোমেনীর সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইরানে বিরাজিত সামাজিক অবিচার। তিনি তীব্রভাবে অন্যায্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এবং 'স্ফীতশীল শাসককূল' ও 'সাধারণ জনগণের' মধ্যকার ক্রমবর্ধমান অসমতাকে সমালোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য কর্তৃক ইরানের শোষণকেও তিনি তীব্রভাষায় নিন্দা করেছেন।

> বিশাল অংকের অর্থ খেয়ে ফেলা হচ্ছে; আমাদের সরকারী অর্থের অপব্যবহার করা হচ্ছে; আমাদের তেল সম্পদকে নিঃশেষিত করা হচ্ছে; এবং বিদেশী কোম্পানীর প্রতিনিধিদের দ্বারা আমাদের দেশকে দুর্মূল্য অথচ অপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে পরিণত করা হচ্ছে যেটা বিদেশী পুঁজিবাদী ও তাদের স্থানীয় এজেন্টদের জন্য আমাদের জনগণের পয়সাকে পকেটস্থ করতে সাহায্য করছে।[২৩]

ইসলামী সমাজের উদ্দেশ্য হলো "ন্যায়-বিচার, একটা ন্যায্য ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকরণ'। এমন একটা সুবিচারভিত্তিক সমাজ যেটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে পরিচর্যা করবে।

সায়্যেদ মওদূদী

সায়্যেদ মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯) একজন পাকিস্তানী চিন্তাবিদ যার লেখা বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সর্বাধিক প্রভাবশালী। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম হলো আন্তর্জাতিক এবং এর বাণী হলো বিশ্বজনীন।

> এটা সমগ্র মানবজাতির প্রতি বিশ্বাস ও নৈতিকতাভিত্তিক একটা সুবিচারমূলক সমাজ ব্যবস্থা উপস্থাপন করে এবং সকলকে এর প্রতি আহবান করে। ... ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো একটা বিশ্ব-রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে বর্ণ ও জাতীয় গোড়ামী ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে এবং সকলের সমান অধিকার ও সমান সুযোগ সমন্বিত একটা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেটা সমগ্র মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এবং যেখানে মানুষের মধ্যে তৈরি প্রতিযোগিতার পরিবর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ

> সহযোগিতার জন্ম দেবে যাতে তারা তাদের একে অপরের বস্তুগত ও নৈতিক উন্নতির জন্য একে অপরকে সাহায্য করবে।[২৪]

জাতীয়তাবাদ ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কারণ এটা জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদ বলতে এটাই বুঝায় যে, একজন জাতীয়তাবাদী অন্যসব জাতীয়তাবাদের উপর নিজের জাতীয়তাকে অগ্রাধিকার দিবে। একজন ব্যক্তি আগ্রাসী জাতীয়তাবাদী না হলেও জাতীয়তাবাদ তার কাছে দাবি করে যে, নিজের জাতির সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার্থে একজন সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনগতভাবে নিজের জাতি ও অন্যের জাতির মধ্যে পার্থক্য রচনা করবে। ঐতিহাসিক ধারা ও প্রথাগত কুসংস্কার শক্তভাবে সংরক্ষণ করবে এবং জাতীয় গর্বের স্পর্শকাতর অনুভূতির জন্ম দিবে।

> সে (জাতীয়তাবাদ) কখনো অন্য কোন জাতির লোককে নিজের সাথে কোনভাবে সমান ভাববে না। যখনই একে অপরের বিরুদ্ধে কোন স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্ন আসবে তখন সকল ন্যায়বোধের বিরুদ্ধে তার হৃদয় রুদ্ধ থাকবে। তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে জাতি-রাষ্ট্র, বিশ্ব-রাষ্ট্র নয়। তথাপি সে যদি কোন বিশ্ব মতবাদের ধারক হয় তবে সেই মতাদর্শ অত্যাবশকীয়ভাবে সাম্রাজ্যবাদ বা বিশ্ব আধিপত্যে রূপ নিবে, কারণ তার রাজ্যে অন্যান্য জাতিগুলো কখনো সমান মর্যাদা পেতে পারে না, প্রজা বা দাস হয়ে থাকতে পারে।[২৫]

মওদূদী বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম হলো একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এটা সমাজ থেকে ধর্মের বিচ্ছেদে বিশ্বাস করে না। ইসলামী রাষ্ট্র চারটি মৌলিক ধারণা-বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল ঃ (১) আল্লাহ হলো সার্বভৌম- যেটা রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি; (২) মানুষ হলো আল্লাহর প্রতিনিধি তাই সে আল্লাহর নির্দেশনা বহির্ভূত হতে পারে না; (৩) শাসনের অধিকার হলো আল্লাহ প্রদত্ত সীমার ভিতরে থেকে সমগ্র বিশ্বাসী সমাজের; (৪) ইসলামী রাষ্ট্র তার সকল কার্যক্রম সমগ্র মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।[২৬]

ইসলামে কম্যুনিটির একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইসলামী শরীয়াহ সামাজিক জীবনের সার্বিক বিষয়ে পথ প্রদর্শন করে যেমন-"পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়, প্রশাসন, নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব, বিচার ব্যবস্থা, যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক আইন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। এক কথায়, এটা মানব জীবনের সবদিকগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। শরীয়াহ হলো একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং একটা সর্বভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা যাতে কোন কিছুই অসার নয় এবং যাতে কোন কিছুরই অভাব নেই।"

সায়্যেদ কুতুব

ইসলামের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ে সায়্যেদ মওদূদীর অনেক ধারণার সাথে সায়্যেদ কুতুবের ধারণার মিল রয়েছে। ইসলামী বাণীর বিশ্বজনীনতায় তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি লিখেছেন :

> ইসলাম এসেছে মানুষের মর্যাদাকে সমুন্নত করতে এবং পৃথিবী ও মাটি এবং রক্ত ও মাংসের বন্ধন থেকে তাকে রক্ষা করতে ... আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াহ যেখানে প্রচলিত আছে যেখানে মানব সম্পর্ক খোদার সম্পর্কের দ্বারা গ্রথিত সেখানে ছাড়া মুসলিমরা সকল দেশের উর্ধ্বে। মুসলিমরা সকল জাতীয়তার উর্ধ্বে তবে শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের উম্মাহর একটা অংশ।[২৭]

তিনি দেখিয়েছেন যে উদারপন্থা ও কম্যুনিজম থেকে ইসলাম সুস্পষ্টভাবে আলাদা। এটা একটা বিশেষায়িত বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী যেটাকে এর নিজস্ব সংজ্ঞায় বুঝতে হবে। সীমাহীন ব্যক্তি স্বাধীনতা, অন্যায্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং কম্যুনিটির অধিকারকে অগ্রাহ্য করার কারণে তিনি উদারবাদকে সমালোচনা করেছেন। তিনি সাম্যবাদকেও এ বলে সমালোচনা করেছেন যে, এতে ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব রয়েছে এবং এটা একটা শ্রেণীর উপর আরেকটা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। তাঁর মতে, ইসলাম এ দুটোর মধ্যে ভারসাম্যময় ব্যবস্থা করে। এটা পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ উভয়টা থেকে শ্রেষ্ঠতর এ কারণে যে, এ দুটো মতাদর্শ কেবলমাত্র বস্তু বিষয়ক, কিন্তু ইসলাম বস্তুবিষয়ক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রয়োজনীয়তাই পূর্ণ করে।

কুতুবের মতে, সামাজিক সুবিচার ইসলামী শাসনের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর মতে, ইসলামে সুবিচার হলো মানুষের সাম্যতা এবং পারস্পরিক সামাজিক দায়িত্বশীলতা। তিনি লিখেছেন :

> [ইসলামী সামাজিক সুবিচার] হলো একটা ব্যাপকভিত্তিক মানবিক সুবিচার। এটা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সুবিচার নয়, তার মানে এতে জীবনের সার্বিক দিক ও সব ধরণের মুক্তি অন্তর্ভূক্ত। এটা মানুষের দেহ, মন এবং আত্মা ও চেতনা সব ব্যাপারেই সতর্ক। এ সুবিচার শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মূল্যবোধ অথবা বস্তুগত মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয় না; এটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে একত্রে গণ্য করে।[২৮]

মূল্যায়ন

ইকবাল প্রত্যক্ষ করেছিলেন কম্যুনিটির বিচ্ছিন্নতা একটা বাস্তবতা হিসেবে। তিনি জাতীয়তাবাদকে একটা বিজাতীয় মতবাদ এবং বিখণ্ডীকরণ শক্তি হিসেবে গণ্য করেছেন যেটা মুসলিম সমাজের মধ্যে বিরাজ করছে। তাঁর মতে, পুঁজিবাদ মুসলিম বিশ্বের উপর একটা অন্যায্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থার অপনোদনে তিনি দু'স্তরে সমাধান পেশ করেছেন। (১) প্রথমতঃ ইসলামী চিন্তাধারাকে আধুনিকতার আলোকে পুনর্গঠন করে তিনি এর সাম্যবাদী মতবাদকে তুলে ধরেছেন। ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধের আলোকে একটা ন্যায্য বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তাঁর প্রচেষ্টা তাঁর উক্ত মনোভাবের ফলশ্রুতি; (২) বাস্তবক্ষেত্রে তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, জাতীয়তাবাদ হলো একটা দ্বিমুখী অস্ত্র, তাই অন্ততঃ রাজনৈতিক পর্যায়ে

স্বাধীনতা অর্জনে এটা ব্যবহার করা যায়। তিনি মুসলমানদেরকে এটা সাময়িক ভাবে গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন যাতে চূড়ান্ত ঐক্য অর্জন ও একটা নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

আধুনিক চিন্তাবিদগণ যারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী তাঁরা পশ্চিমা জাতি রাষ্ট্রকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন হয়তো উদারপন্থী নতুবা সমাজবাদের শ্রেণীভুক্ত। তাঁদের মতবাদ ছিল ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মুহাম্মদ আইয়ুব খান ও জামাল আব্দুল নাসেরের মতামত বিষয়ক আমাদের পর্যালোচনা এটা স্পষ্ট করে যে, তারাঁ উভয়ই মূলতঃ শক্তিশালী, মজবুত ও আধুনিক জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সচেতন ছিলেন। তাঁদের একজন সেটা পাশ্চাত্য উদার ধারায় এবং অন্যজন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ধারায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীও মূলতঃ ভৌগলিক সীমার দ্বারা আবদ্ধ ছিল, আর সরকারী নীতিকে জাতীয় স্বার্থের ধুয়া দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতেন যার ফলাফল ছিল যে জাতীয় স্বার্থ হলো সবকিছুর উর্ধ্বে। ইসলামী আন্ত র্জাতিকতাবাদকে তাঁরা খুব কমই গুরুত্ব দিয়েছেন।

উত্তর-আধুনিক চিন্তাবিদগণ ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী। তাঁরা মনে করতেন জাতীয়তাবাদ হলো ইসলামী চিন্তাধারায় একটা বিজাতীয় ধারণা এবং একটা সাংস্কৃতিক কাঠামো যেটাকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম বিশ্বের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, তাই তাঁরা এটাকে সম্পূর্ণভাবে র্বজন করতে আহবান করেছেন। তাঁরা সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যেটাকে তাঁরা অন্যায্য, নিপীড়ক এবং পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন। মুসলিম উম্মাহর একীভূতকরণ সম্ভাব্যতাকে তাঁরা অবধারিত বিষয় বলে মনে করতেন। নিজস্ব ঐতিহ্যকে নিজস্ব অর্থে অনুধাবন করতেও তাঁরা গুরুত্বারোপ করেছিলেন। পরিবর্তিত অবস্থার আলোকে বিবর্তনের মাধ্যমে তাঁরা ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা গুরুত্বারোপ করে বলেছেন যে, সামাজিক সুবিচার হলো ইসলামী রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য এবং যুক্তি পেশ করেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ইসলামী সুবিচারের ভাবধারাকে লংঘন করেছে ❐

চতুর্থ অধ্যায়
পরিশিষ্ট

দৃশ্যতঃ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উদারবাদ ও মার্কসবাদ উভয়ই তাদের বিশ্লেষণে মৌলিকভাবে একই রকম। উভয় চিন্তাধারাই তাদের মতবাদকে পশ্চিমা ইউরোপের ঐতিহাসিক ধারার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। আন্তর্জাতিকবাদের মোড়ক থাকা সত্ত্বেও উভয় মতবাদই ইউরোপীয় নৃ-কেন্দ্রিক। উভয় ধারার আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ বিশ্বাস করেন যে, জাতীয়তাবাদ হলো আধুনিকায়ন বা পুঁজিবাদের প্রাথমিক স্তরের ফলাফল। উভয়ই একটা পর্যায়ে জাতীয়তাবাদের একীভূতকরণের উপর জোর দেয়। উভয়ই বিশ্বাস করে যে ইতিহাস আন্তর্জাতিকতাবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে একটা এটাকে পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে আর অন্যটা দেখে শ্রমজীবী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীতে। উভয়ই দাবি করে তারা প্রত্যেকে উত্তর-আলোকায়ন বুদ্ধিবৃত্তিবাদের (Enlightenment) উত্তরসূরী। উভয়ই বিশ্বাস করে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বকে। উভয়ই মনে করে সংস্কৃতি হলো গতানুগতিক ও প্রাচীন। মজার বিষয় হলো উভয় মতবাদই ইসলামকে একইভাবে মূল্যায়ন করে। উদারবাদ ইসলামকে মূল্যায়ন করে নিছক বিভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতির উপাদানগুলোর একটা হিসেবে। তাদের মতে মিশরীয় ইসলাম, পাকিস্তানী ইসলাম, ইরানী ইসলাম ও ইন্দোনেশীয় ইসলামের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মার্কসবাদীরাও ঠিক একইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিতরে উজবেক ইসলাম, তাজিক ইসলাম এবং আন্তঃককেশীয় ইসলামের মধ্যে পার্থক্য টেনেছিলেন। ইরান ও আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক [১৮৯০'র দশকে] ঘটনাবলীর আগ পর্যন্ত উভয় মতবাদই ইসলামী ঐতিহ্যের আন্তর্জাতিক গুরুত্বকে উপেক্ষা করত। তাদের ধারণা ছিল যে, আধুনিকতার অগ্রযাত্রায় ধর্ম পর্যায়ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

উভয় মতধারার উত্তর আধুনিকায়ন চিন্তাবিদগণ অবশেষে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, বিশ্ব তাদের পূর্বসূরীদের ধারণা মত চলেনি। যে বিশ্ব কোন এক সময় কোন না কোন একীভূতকরণের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল বলে মনে হতো, সে বিশ্ব এখন খণ্ড-বিখণ্ডতার মুখোমুখী। নৃ-জাতীয়তাবাদ এবং পুরাতন রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদ উভয়ের উত্থান, ধর্মীয় পুনর্জাগরণ এবং উদারপন্থা ও মার্কসবাদের আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে পিছিয়ে আসা- এগুলো সবই হলো নব্য বাস্তবতা বা বৈপরীত্যতা যার বিশাল গুরুত্বকে উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল। ক্রমেই বিশ্বকে মনে হয়েছে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, দুর্বোধ্য ও অর্থহীন।

ইসলামী চিন্তাধারার চিন্তাবিদগণ ব্যাপারগুলোকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেছেন পুঁজিবাদের বিস্তারের পাশাপাশি উদারবাদের বিশ্বব্যাপী বিস্তার। তাঁদের মতে সমাজবাদ কোন গ্রহণযোগ্য বিকল্প পেশ করতে পারেনি। এটাকে প্রকৃতপক্ষে দেখা হয়েছে গর্তে নিপতিত উদারপন্থাবাদের সাথে প্রতিযোগী আরেকটা

পাশ্চাত্য মতাদর্শ হিসেবে। ইসলামের সঙ্গে এতদ্বয়ের ছিল মৌলিক পার্থক্য ও সংঘর্ষ। ইসলামী চিন্তাবিদগণ পুঁজিবাদের প্রসারকে ধরে নিয়েছেন বিশ্বব্যাপী একটা অন্যায্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। তাঁরা এর বিখণ্ডীকরণ প্রভাবের কথাও উল্লেখ করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে মানব সমাজ অভ্যন্ত রীণভাবে নিপীড়ক ও নিপীড়িত এ দু'শ্রেণীতে এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে। খোদ জাতীয়তাবাদকেই ধরা হয়েছিল বিজাতীয় ও ইসলামের সাথে সংঘর্ষশীল হিসেবে। মূলধারার ইসলামী চিন্তাবিদগণ যুক্তি পেশ করেছেন যে, তাঁদের মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বজনীন উম্মাহ। তবে মুসলমানদের উচিত সাময়িকভাবে জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করা যাতে তারা একের পর এক মুসলিম জনগণকে স্বাধীন করতে পারে। ইকবাল যুক্তি দেখিয়েছেন যে, জাতীয়তাবাদ যেটা বিশ্ব-মুসলিমের সামষ্টিক মুক্তি আনয়নে সক্ষম সেটা ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠায় একটা অত্যাবশকীয় পদক্ষেপ ।

মুসলিম বিশ্বের আধুনিকতাবাদী চিন্তাবিদগণ যারা অধিকাংশই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সাথে সাথে উদার জাতীয়তাবাদকে চূড়ান্ত বাস্তবতা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। উদারপন্থী বা সমাজবাদী যেটাই হোক না কেন তাঁরা পশ্চিমা মডেলকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছিল। এটা ছিল সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যকরণ ও আধুনিকায়নের যুগ যার জন্য পাশ্চাত্যে দীক্ষিত শ্রেণী উঠে-পড়ে লেগেছিল। ঐতিহ্যগত সবকিছুই বর্জন করতে হবে এবং দৃষ্টিভঙ্গীর ও প্রাতিষ্ঠানিক আধুনিকায়নকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। কিন্তু উদারবাদ ও সমাজবাদভিত্তিক তিরিশ বছরের রাজনৈতিক প্রয়াস পরিশেষে কার্যকর কিছু উপহার দিতে ব্যর্থ হয়। অভ্যন্ত রীণভাবে প্রায় প্রত্যেকটা মুসলিম দেশই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বৈধতার সংকটে ভুগেছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসমতা সমস্যা আধুনিকায়নের চেয়েও দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আধুনিকায়নের এ পর্যায়ক্রমিক প্রচেষ্টা-পাশ্চাত্যের অনুকরণ, ধার করে আনা মডেলের ব্যর্থতা, ফলশ্রুতিগত পশ্চিমা-বিরোধী পশ্চাদাঘাত-অধিকাংশ মুসলিম দেশে তাদের ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও অবিশ্বাস্য রকমের সামঞ্জস্যতা দেখা দিয়েছিল।

এক্ষেত্রে মৌলিক যে বৈপ্যরিত্য ছিল সেটা হলো মুসলিম দেশগুলো পশ্চিমা-ইউরোপীয় অর্থে "জাতি-রাষ্ট্র" ছিল না; বরং সেগুলো ছিল বাস্তবিকপক্ষে 'রাষ্ট্র' যারা পশ্চিমা ধারণামত 'জাতি' হওয়ার চেষ্টা করেছিল। জাতীয়তাবাদ ছিল একটা ক্ষুদ্র শহুরে অভিজাত শ্রেণীর আদর্শ অথচ বিশাল জনগোষ্ঠীর আদর্শ ছিল ইসলামের আন্তর্জাতিক সাম্য ও ঐক্যবাদ। মুসলিম জাতির একজন নিবিড় পর্যবেক্ষক হামিদ এনায়েতের মতে ঃ

> জাতীয়তাবাদ কখনো মুসলিম আত্ম-চেতনায় বিরাজ করত না সেটা নগরেই হোক আর গ্রামেই হোক। তবে এটা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বা ইহুদীবাদ বিরোধী দ্ব্যর্থ শ্লোগান হিসেবে বিরাজ করত। পশ্চিমা বিশ্বের মত জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে দ্ব্যর্থহীন প্রবক্তা ও মহাপুরুষেরা বর্জুয়া ও অভিজাত শ্রেণী থেকে উদগত। সেজন্য

> তাদের জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ ছিল জন-প্রশাসন, শিক্ষক, মধ্য-পর্যায়ের সামরিক অফিসার এবং তুলনামূলকভাবে ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে। ... উচ্চ এবং মাধ্যমিক সমাজ পশ্চিমা ধারণা ও এর অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু সাধারণ জনগণ প্রাচীন ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের প্রতি অনুগত ছিল।[১]

মুসলিম বিশ্বের উত্তর-আধুনিকতাবাদী চিন্তাবিদগণ যাঁরা প্রায় সবাই স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত ছিলেন তাঁরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে এমন ভাষায় পুনঃগঠন করেছিলেন যেটা আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবধারায় পশ্চাৎপদদের নিকট বোধগম্য ছিল। তাঁদের প্রধান যুক্তি ছিল যে, ইসলাম হলো একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যেটা তার নিজস্ব সংজ্ঞায় বুঝতে হবে। ইসলামের নামের আগে বা পরে কোন উদার বা সমাজবাদী বিশ্লেষণের যোগ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এটা একটা পরিপূর্ণ বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী যেটা সম্পূর্ণরূপে এর অতিমানবীয় অলৌকিক ধারণা বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে । তাঁদের যুক্তিমতে, ইসলামী ব্যবস্থায় মূল্যবোধের যে স্তরবিন্যাস তার ভিতরে সামাজিক সুবিচারের ধারণাটা হলো কেন্দ্রীয়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ইসলামী আদর্শের এ কেন্দ্রীয় মূল্যবোধকে লংঘন করে। এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাঁরা নৃ-জাতিক বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন কিন্তু জাতীয়তাবাদকে পুরোপুরিভাবে বর্জন করেছেন এবং এটাকে পাশ্চাত্য দ্বারা আরোপিত সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক রূপ বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সমস্ত বিজাতীয় আদর্শ বর্জন না করলে এবং মূল দেশজ ঐতিহ্যের পুনঃরুজ্জীবন না ঘটলে সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়।

উদার ও মার্কসবাদী চিন্তাধারার সাম্প্রতিককালের চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে, জাতীয়তাবাদ হলো প্রভাবশালী ও রাজনীতির প্রাকৃতিক কাঠামো। তবে ইসলামী চিন্তাধারার মতে এটা হলো একটা বিজাতীয় মতাদর্শ যেটা উপনিবেশবাদী শক্তির দ্বারা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতে বর্তমানের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ইউরোপীয় সংস্কৃতির রক্ষা কবচ মাত্র। তাঁদের মতে সাংস্কৃতিক মুক্তি তখনই সম্ভব যখন মুসলিম উম্মাহ এটা থেকে বেরিয়ে এসে সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদের দিকে অগ্রসর হয়।

এ বিষয়ে আমাদের উপরোক্ত বিশ্লেষণ আমাদেরকে জাতি-রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক কাঠামোর একটা সর্বজন গৃহীত একক হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করতে বাধ্য করে। আমাদের যুক্তি হলো যে মুসলিম দেশগুলো পশ্চিমা ইউরোপীয় ধাঁচে জাতি রাষ্ট্র নয়, বরং সেগুলো হলো রাষ্ট্র যেগুলো পশ্চিমা আদর্শে জাতি হওয়ার প্রচেষ্টা করছে। কিন্তু সেগুলো ইসলামী সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদ যা আন্তর্জাতিক পরিচিতির মাধ্যমে মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যতা ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর প্রতি আনুগত্যতা এ দু'য়ের মধ্যকার প্রতিযোগিতার সর্বশেষ ফলাফল কি দাঁড়াবে সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কোন কিছু বলা অবশ্য এ পর্যায়ে অপরিপক্কতার পরিচয় হবে। তবে এটা স্পষ্ট যে,

জাতীয়তাবাদ ইসলামী সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

আমাদের বিশ্লেষণ এটাও নির্দেশ করে যে, ইসলামী সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদের উত্থান একই সঙ্গে পশ্চিমা উদারবাদ ও মার্কসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং এর নিজস্ব পরিচিতির প্রমাণস্বরূপ। এটা এমন একটা বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী যেটাকে এর নিজস্ব সংজ্ঞায় বুঝতে হবে। মূল্যবোধের স্তরবিন্যাসে সামাজিক সুবিচার কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে যেটার দিকে ইসলামী ব্যবস্থা ধাবিত হয়। যারা সত্যিকারভাবে আন্তর্জাতিক বাস্তবতার জটিলতা সম্পর্কে বুঝতে চায় তাদের জন্য ইসলামকে এর নিজস্ব সংজ্ঞায় অনুধাবন করা জরুরী।

আমাদের পর্যালোচনা এটাও নির্দেশ করে যে, 'আন্তর্জাতিক' শব্দের নামে করা অধিকাংশ আলোচনাই সাম্যবাদী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কেন্দ্রীভূত। প্রত্যেকটার চিন্তাধারা বিশ্বকে তার নিজস্ব মূল্যবোধের আলোকে অনুধাবন করে। প্রতিটা চিন্তাধারা বিশ্বকে এর নিজস্ব কল্পনায় একীভূত করতে চায়। কিন্তু যখন এটাকে অন্য চিন্তাধারার আলোকে দেখা হয় তখন তাকে সাম্রাজ্যবাদী মনে করা হয়। নিজস্ব মূল্যবোধের গণ্ডি পেরিয়ে অন্য মতাদর্শের মূল্যবোধকে অনুধাবন করতে প্রচেষ্টা একদমই হয়নি অথবা হলেও তা খুবই সামান্য। আমরা বিশ্বাস করি যে, মূল্যবোধের দৃশ্যতঃ বৈপরিত্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। ঐ সকল ঐতিহ্যগুলোর মধ্যকার সাজুয্যতার মাত্রা কিংবা এদের মূল্যবোধের অন্তঃসারশূন্যতা বিশ্লেষণ করা এখানে সম্ভব নয়, তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, যে কোন ধরণের বিশ্ব-ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা অনেকাংশে নির্ভর করবে সে ব্যবস্থা কতটুকু পারস্পরিক সাজুয্যতা ও অংশীদারিত্বের সঙ্গে মিল রাখে কিংবা অমিল রাখে □

পাদটীকা

সূচনা

১. A.J. Toynbee, *A Study of History* (London: Oxford University Press, 1947), Vol I.

২. Karl Marx and Fiedirk Engels, *The Communist Manifesto*, (New York: Penguin Books, 1967).

৩. Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (Lahore: Sheikh Muhammad Ashraf, 1975).

৪. উদারপন্থাবাদ ধরে নিয়েছিল জাতীয়তাবাদ নিশ্চিহ্ন হবে কারণ "ব্যবসা বাণিজ্যের এখন আর কোন সীমা নেই; বুদ্ধিবৃত্তি কোন সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়; এবং শিক্ষা, সম্পদ ও শিল্পের প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে কুসংস্কার, কুপ্রথা ও সংকোচনীতি সেগুলো সীমানা প্রাচীর রচনা করে, তা ধ্বংস হবে।" মার্কসবাদও ভবিষ্যৎবাণী করেছিল জাতীয়তাবাদের ধ্বংসের ব্যাপারে। কারণ, "শিল্প-শ্রমিকরা অস্থায়ী এবং উৎসহীন হতে বাধ্য হয়; তাদের শ্রম হলো সমজাতীয় ও অভিন্ন। তাদের কোন স্থানীয় সংঘ নেই, আনুগত্য দূরের কথা, একটা ক্ষুদ্রতর উৎপাদিত দ্রব্যও স্থানীয় ঐতিহ্যের বিভিন্নতা নির্ধারণ করতে পারে। Ernest Gellner, *Thought and Change*, (Chicago : University of Chiago Press, 1978), pp. 147-148)। "উদারবাদ" বলতে আমরা বুঝি "পাশ্চাত্যে প্রভূত্বশীল আদর্শ ... সাম্প্রতিককালের উদারবাদের রূপ অনুযায়ী এটা কোন ধারণা বা রীতি বিশ্বাসের সমষ্টি নয় যেটাকে মানুষ সচেতনভাবে গ্রহণ করে। এটা হলো সামাজিক জীবনকে অবলোকন করার একটা মাধ্যম এবং এ সম্পর্কিত কিছু ধারণা-বিশ্বাসের সমষ্টি। এটা ব্যক্তি এমন স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দতার সাথে গ্রহণ করে যে, সে ঐসকল ধারণা-বিশ্বাসের ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকে না। Anthony Alblaster, *The Rise and Decline of Western Liberalism* (New York : Basil Blackwell, 1984).

৫. E.A Tiryakian and Ronald Rogowski, *New Nationalism of the Development West*, (Hoston: Allen & Unwin, 1985); Walker Corner, *The National Question in Marxist-Leninist Theory Groups in Conflict*, (Berkeley : University of California Press, 1985).

৬. K. J. Holsti-র মতে "... আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বের কোন বিশেষ ধারা জাতীয়তাবাদী আচরণকে সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক নিয়মের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গুরুত্বারোপ করেনি।" দেখুন, K. J. Holsti রচিত "Change in the International System : Interdependence, Ingegration, and Fragmentation:, in Ole R. Holsti and R. M. Siverson, eds., *Change in the International System*, (Colorado : Westview Press, 1980).

৭. Gale Stokes, "The Undeveloped Theory of Nationalism", *World Politics*, (October 1978); Arthur N. Waldron, "Theories of Nationalism and Historical Explanations", *World Politics*, (April 1985).

৮. Anthony D. S. Smith, *Nationalism in the Twentieth Century* (New York : New York University Press, 1979).

৯. কিছু বিখ্যাত গ্রন্থ যেমন- Hamid Enyat, "The Resurgence of Islam", *History Today*, (February 1980); *Modern Islamic Political Thought* (Austin : Uniersity of Texas, 1982); Mohammad Ayoob, ed., *The Politics of Islamic Reassertion*, (London : Croom Helm, 1981); Ali E. L. Dessouki, *Islamic Resurgence in the Arab World*, (New York : Praeger Publishers, 1982); R. H. Dekmejian, *Islam in Revolution*, (New York : Syracuse University Press, 1985); John Donahue and J. L. Esposito, *Islam in Transition : Religion and Socio Political Change,* (New York : Syracuse University Press, 1982); John L. Esposito, Islam and Development, (New York : Syracuse University Press, 1980); John L. Esposito. ed., *Voices of Resurgent Islam* (New York : Oxford University Press, 1983); G. H. Jansen, *Militant Islam*, (London : Andre Deutsch, 1981); C. K. Pullapilly, ed., *Islam in the Contemporary World.* (Indiana : Cross Road Books, 1980) Philip Stoddard et al., *Change and the Muslim World*, (New York : Syracuse University Press, 1981), *The Muslim World Book Review*, (Summer 1982).

১০. পশ্চিমা উদারপন্থীদের মতামতের প্রতিনিধিত্বকারী Ernest Gellner *From Nationalism to Revolutionary Islam*, ed., Said A Arjomand, (Albany : State University of New York Press, 1984), সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ে Analyzing Islam's Reactionary Movements", *The Current Digest of the Soviet Press,* vol. XXIV, no. 32, 8 September, 1982.

১১. Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution* (Chicago : University of Chicago Press, 1970).

১২. উন্নয়ন বিষয়ে ভারতীয়, চৈনিক ও ইসলামী চিন্তাধারা বিষয়ে দেখুন, Van Nieuwenhuijze, *Development Regardless of Culture?,* (Leiden : E. J. Brill, 1984).

প্রথম অধ্যায় : উদারতাবাদ

১. A. J. Toynbee, A Study of History, Vols. I and II, (London : Oxford University Press, 1947, 1957)

২. A. J. Toynbee, *A Study of History*, Vol. II, pp. 312-313.

৩. A. J. Toynbee, *A Study of History*, Vol. I, p. 204.

৪. A. J. Toynbee, *A Study of History*, Vol. I, pp. 8-9.

৫. A. J. Toynbee, *A Study of History*, Vol. I, p. 241.

৬. E. H. Carr, *Twenty Years' Crisis 1919-1939,* (New York : Harper and Row, 1964), pp. 85-88.

৭. নিম্নের আলোচনাটা করা হয়েছে এ গ্রন্থ অনুসারে- E. H. Carr, *Nationalism and After,* (London : McMillan, 1945)

৮. Ken Wolf, "Hans Kohn's Liberal Nationalism", *Journal of the History of Ideas*, vol. 4, (October-December, 1976), pp. 651-672.

৯. Hans Kohn, *The Idea of Nationalism,* (New York : McMillan, 1948), p. 16.

১০. Hans Kohn, *The Idea of Nationalism,* p. 21.

১১. Ken Wolf. (1976), p. 672.

১২. C. J. H. Hayes, *Nationalism : A Religion* (New York : Mcmillan, 1960), p.6.

১৩. C. J. H. Hayes, *Nationalism : A Religion,* (New York : Mcmillan, 1960), p. 45.

১৪. C. J. H. Hayes, *The Historical Evolution of Modern Nationalism,* (New York : Rick R, Smith, 1931).

১৫. Hayes (1960), p. 109.

১৬. Hayes (1931), p. 308.

১৭. K. W. Deutsch, *Political Community at the International Level,* (New Jersey : Doubleday, 1954); K. W. Deutsch et. al., *Political Community and the North Atlantic Area,* (Princeton : Princeton University Press, 1957); E. B. Haas, *The Uniting of Europe, (Stanford : Stanford University Press, 1964).*

১৮. K. W. Deutsch, *Nationalism and its Alternative,* (New York : Alfred A. Knopf, 1969), p. 190.

১৯. Haas (1964).

২০. Robert O. Keohane and J. S. Nye, "International Interdependence and Integration", in EI. Greenstein and N. W. Polsby, eds., *Handbook of Political Science,* Vol. 8, (Reading, Ma.: Adison-Wesley, 1975); *International Organization.* Special Issue on Transational Relations, vol. 25, No. 3 (Summer 1971).

২১. S. D. Krasner, ed., *International Regimes, International Organization,* 36, no. 2 (Spring 1982), p. 185.

২২. S. D. Krasner, ed., *International Regimes, International Organization*, 36, no. 2 (Spring 1982), p. 499.

২৩. K. J. Hoisti, "Change in the International System : Interdependence. Integration and Fragmentation", in Ole R.

Hoisti and R. M. Siverton, eds., *Change in the International System*, (Colorado : Westview Press, 1980), p. 29.

২৪. K. W. Deutsch, *Nationalism and Social Communication,* (Cambridge : MIT Press, 1953).

২৫. Deutsch (1969), p. 25.

২৬. Deutsch (1969), p. 27.

২৭. Ernest Gellner, *Nations and Nationalism*, (Ithaca: Cornell University Press, 1983P.

২৮. Ernest Gellner, 1983, p. 112.

২৯. Ernest Gellner, 1983, pp. 41-46.

৩০. Walker Connor, "Nation-Building or Nation-Destroying", World Politics, (April 1962).

৩১. F. William J. Foltz, "Modernization and Nation-Building : The Social Mobilization Model Reconsidered", in Richard Merrit and Bruce M. Russet, eds., *From National Development to Global Community*, (London : Allen & Unwin, 1981), p. 31.

৩২. Connor (1982), p. 322.

৩৩. Connor.

৩৪. A. D. Smith, *Theories of Nationalism*, (New York : Holmer and Meier, 1983).

৩৫. A. D. Smith, *Nationalsim in The Twentieth Century*, (New York University Press, 1979).

৩৬. Smith (1983), Introduction.

৩৭. Smith (1983), p. 231.

৩৮. Smith (1983), p. 39.

৩৯. Smith (1983), p. 260.

৪০. A. D. Smith, "Ethnic and Nation in the Modern World" *Millennium : Journal of International Studies,* Vol. 14, no. 2, Summer 1985.

৪১. Crawford Yound, 'The Temple of Ethnicity,' *World Politics*, (July 1983).

৪২. Clifford Geertz, "The Integrative Revolution : Primordial Sentiments and Civil Politics in New States," in C. Geertz, ed., *Old Societies and New States*, (Glencose. III, Free Press, 1968); Harold Isaacs, *Idols of the Tribe*, (New York : Harper & Row, 1975).

৪৩. Joseph Rothschild, *Ethno-Politics : A Conceptual Framework* (New York : Columbia University Press, 1981); Paul R. Brass, "Ethnicity and National Formalism," *Ethnicity*, vol. 3, no. 3, (Sept. 1976), pp. 225- p. 145. p. 22. p. 129. p. 20. pp. 62-63, 241; Nelson Kasfir, "Explaining Ethnic Political Participation," *World Politics,* vol. 312, no. 3 (April 1979), pp. 365-388.

৪৪. স্মীথ এর মতামত হানাহ আরেন্ট (Hannah Arendt) এর মতামত থেকে ভিন্ন যিনি কার্লটন হায়েসের মত বিশ্বাস করেন যে, জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ সব একই ধরনের মতবাদ যেগুলো জাতি রাষ্ট্রের ব্যর্থতার কারণে একটা আরেকটাতে পরিবর্তিত হয়। Hannah Arendt, *The Origins of Totaliarianism,* vols. I-III, (New York : Harcourt, Brace and World, 1951).

দ্বিতীয় অধ্যায় : মার্কসবাদ

১. Karl Marx and Friedrich Engels, *The Communist Manifesto,* (New York : Penguin Books, 1967), p. 84.

২. Joseph Petrus, "Marx and Engels on the National Question," *Journal of Politics*, vol. 33, (1971), pp. 7979-825.

৩. Marx and Engels (1967).

৪. Walker Connor, *The National in Marxist-Leninist Theory and Strategy*, (Princeton : Princeton University Press, 1984).

৫. Vladimir Lenin, *Questions of National Policy and Proletarian Internationalist.* (Moscow : Progress Publishers. 1953), p. 30.

৬. Alfred D. Low, *Lenin on the Question of Nationality*, (New York : Okman Associates, 1958).

৭. Lenin (1953).

৮. Walker Connor (1984), p. 29.

৯. Horace B. Davis, ed., *The National Question : Selected Writings of Rosa Luxemburg*, (New York : Monthly Review Press, 1976).

১০. *Selected Writings of Rosa Luxemburg*, (New York : Monthly Review Press, 1976), p. 295.

১১. Lenin (1953), p. 18.

১২. Lenin (1953), p. 145.

১৩. Lenin (1953), p. 22.

১৪. Lenin (1953), p. 129.

১৫. Lenin (1953), p. 20.

১৬. Lenin (1953), pp. 62-63.

১৭. Lenin (1953), p. 80.

১৮. Lenin (1953), p. 195.
১৯. Joseph Stalin, *Marxism and National and Colonial Questions*, (New York: International Publishers, n.d.) and *The National and Leninism*, (Calcutta: Mass Publications, 1976).
২০. Joseph Stalin, 1976, pp. 17-18.
২১. Walker Connor (1984),
২২. Walker Connor (1984), pp. 87-88.
২৩. Walker Connor (1984), p. 89.
২৪. Walker Connor (1984), p. 90.
২৫. Gail W. Ladipus, "Ethno-nationalism and Political Stability : The Soviet Case," *World Politics* (July 1984).
২৬. Pravada, February 24, 1981, p. 556.
২৭. Pravda, December, 1982, p. 556.
২৮. Peter D. Philips and Immanuel Wallerstein, "National and World Identities and the Interstate System", *Millennium : Journal of International Studies*, (Summer 1985).
২৯. Michaelk, *Internal Colonialism : The Celtic Fringe in British National Development*, (London : Routledge & Paul, 1985).
৩০. Tom Nairn, "The Modern Janus", *New Left Review*, (November-December, 1985).
৩১. Tom Nairn, 1985.
৩২. Tom Nairn, 1985.
৩৩. Tom Nairn, 1985.

তৃতীয় অধ্যায় : ইসলাম

১. Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age : 1798-1939,* (London : Oxford University Press, 1970), p. 344.
২. ইকবাল ছিলেন একজন অসাধারণ কবি ও দার্শনিক যিনি উর্দূ, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় কাব্যচর্চা করতেন। এখানে তাঁর নিম্নোক্ত গ্রন্থখানা গ্রহণ করা হয়েছে। Sir Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (Lahore : S. M. Ashraf, 1944).
৩. Nikki R. Keddie, *An Islamic Response to Imperialism : Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad din "ad-Afghani"* (Berkeley : University of California Press, 1983).
৪. Sharif al Mujahid, "Muslim Nationalism : Iqbal's Synthesis of Pan-Islamism and Nationalism", *American Journal of Islamic Social Sciences*, vol. 2, no. 1, (July 1985).

৫. Iqbal (1944), p. 169.
৬. Zafar Ishaq Masri, "Iqbal and Nationalism," *Iqbal Review,* (April, 1961), pp. 51-89.
৭. Muhammad Iqbal, *Darb-i-Kalim*, (Lahore, 1959), pp. 54-55.
৮. Shamloo, ed., *Speeches and Statements of Iqbal*, (Lahore : Al_Manar Academy, 1949), p. 54.
৯. Zafar Ishaq Ansari (1961).
১০. Iqbal (1944), p. 169.
১১. Muhammad Iqbal, Bang-i-Dira, (Lahore, 1959), pp. 173-74.
১২. S. A. Vahid, *Thoughts and Relfections of Iqbal*, (Lahore : Ashraf, 1964)_, p. 396.
১৩. Muhammad Ayub Khan, *Friends Not Masters,* (London : Oxford Univresity Press, 1967).
১৪. Muhammad Ayub Khan, 1967.
১৫. Gamal Abdel Nasser, *The Philosophy of the Revolution*, (Cairn : Ministry of National Guidance, U. A. R., n.d.).
১৬. Gamal Abdel Nasser.
১৭. Imam Khomeini, *Islam and Revolution,* tr. Hamid Algar, (Berkeley : Mizan Press, 1991).
১৮. Imam Khomeini (1991), p. 302.
১৯. Imam Khomeini (1991), p. 49.
২০. Imam Khomeini (1991), p. 50.
২১. Imam Khomeini (1991), p. 34.
২২. Imam Khomeini (1991)
২৩. Sayyid Abul A'la Mawdadi, *Nationalism and India*, (Pathankot : Maktaba-i-Kama' at-i-Islami, 1967).
২৪. Sayyid Abul A'la Mawdadi, 1967.
২৫. Sayyid Abul A'la Mawdadi, *Political Theory of Islam*, (Lahore : 1960).
২৬. Sayyid Qutb, *Social Justice in Islam,* (Cairo, ad.).
২৭. Sayyid Qutb.

চতুর্থ অধ্যায় : পরিশিষ্ট

১. Hamid Enayat, "The Resurgence of Islam", *History Today*, (February, 1980).

গ্রন্থপঞ্জী

1. Ablaster, Anthony. *The Rise and Decline of Western Liberalism,* New York : Basil Blackwell, 1984.
2. Ansari, Zafar Ishaq, "Iqbal and Nationalism", Iqbal Review. (April 1961).
3. Arandt, Hannah, *The Origins of Totalitarianism,* New York : Harcourt, Brace and World, 1951, vols. I-III.
4. Ayoob, Mohammad, ed., *The Politics of Islamic Reassertion* ,London : Croom Helm, 1981.
5. Brass, Pauol B., "Ethnicity and National Formalism", Ethnicity 3, no. 3 (1976) : 225-241.
6. Carr, E. H., *Nationalism and After,* London : Mcmillan, 1945.
7. ... *Twenty Years Crisis 1919-1939*, New York: Harper and Row, 1964.
8. Connor, Walker, *The National Question in Marxist-Leninist Theory and Strategy,* Princeton : Princeton University Press, 1984.
9. ..., "Nation-Building and Nation-Destroying", *World Politics*, (April 1982).
10. Davis, Horace B. ed., *The National Question : Selected Writings of Rosa Luxemburg,* New York : Monthly Review Press, 1976.
11. Dekmejian, R. H. *Islam in Revolution*, New York : Syracuse University Press, 1985.
12. Dessouki, Ali E. L., *Islamic Resurgence in the Arab World*, New York : Praeger Publishers, 1982.
13. Deutsch, K. W., *Nationalism and its Alternatives*, New York : Alfred A. Knopf, 1969.
14. ..., *Nationalism and Social Communication*, Cambridge : MIT Press, 1953.
15. ...,.*Political Community and the North Atlantic Area*, Princeton : Princeton University Press, 1957.

16. Donahue, Joan Esposito, J. H., *Islam in Transition : Religion and Socio-Political Change*, New York : Syracuse University Press, 1982.

17. Enyat, Hamid, *Modern Political Thought,* Austin : University of Texas, 1982.

18. ..., The Resurgence of Islam, *History Today,* (February 1980).

19. Nasser, Gamal Abdel, *The Philosophy of the Revolution, Cairo :* Ministry of National Guidance, n.d.

20. Nieuwenhuijze, C. A. O. Van, *Development Regardless of Culture*, Leiden : E. J. Brill, 1984.

21. Petrus, Joseph, "Man and Engels on the National Question", *Journal of Politics*, 33 (1971).

22. Philips, Peter D. and Wallerstein, Immanuel, "National and World Identities and the Interstate System", *Millennium : Journal of Internal Studies,* (Summer 1985).

23. Pullapilly, C. K., ed., *Islam in the Contemporary World?* Indianan : Crossroad Books, 1980.

24. Qutb, Sayyid, *Social Justice in Islam*, Cairn : n.d.

25. Rothschild, Joseph, *Ethno-Politics : A Cenceptual Framework,* New York : Columbia University Press, 1981.

26. Shamloo, ed., *Speeches and Statements of Iqbal*, Lahore : Almanar Academy, 1949.

27. Smith, A. D., "Ethnic and Nation in Modern World", *MU Journal of International Studies*, 14, no. 2 (Summer 198)

28. ... , *Nationalism in the Twentieth Century,* New York : New York University Press, 1979.

29. ... , *Theories of Nationalism,* New York : Holmer and Meier, 1983.

30. Stalin, Joseph, *Marxism, National and Colonial Questiions*, New York : International Publishers, n.d.

31. ... , *The National Question and Leninism,* Calcutta : Mass Publishers, 1976.

32. Stoddard, Philip et. al., eds., *Change and the Muslim World*, New York : Syracuse University Press, 1981.

33. Stokes, Gale, "The Undeveloped Theory of Nationalism", *World Politics,* (October 1978).

34. Tiryakian, E. A. and Rogowski, Ronald, *New Nationalisms of the Developed West,* Boston : Allen and Unwin, 1985.

35. Toynbee, A. J., *A Study of History*, London : Oxford University Press, vol. I and II, 1947 and 1957.

36. Vahid, S. A., *Thoughts and Reflections of Iqbal*, Lahore : Ashraf, 1964.

37. Waldron, Arthur N., "Theories of Nationalism and Historical Explanations", *World Politics,* Esposito, John L., *Islam and Development.,* New York : Syracuse University Press, 1980.

38. ... , *Voices of Resurgent Islam*, New York : Oxford University Press, 1983.

39. Foltz, William J., "Modernization and Nation-Building : The Social Mobilization Model Reconsidered", *From National Development to Global Community*, ed., Richard Mervit and Bruce M. Russet, London : Allen and Unwin, 1981.

40. Geertz, Clifford, "The Integrative Revolution : Primordal Sentiments and Civil Politics in New States" *Old Societies and New States,* ed., C. Geertz, Glencose III : Free Press, 1968.

41. Geilner, Ernest, "Analyzing Islam's Reactionary Movements", *The Current Digest of the Soviet Press,* XXIV. no. 32.

42. ... , "Introduction" *From Nationalism to Revolutionary Islam*, ed., Said A. Aijomand, Albany : State University of New York Press, 1984.

43. ... , *Nations and Nationalism,* Ithaca : Cornell University Press, 1983.

44. ... , *Thought and Change,* Chicago : University of Chicago Press, 1978.

45. Haas, E. B., *The Uniting of Europe*, Stanford : Stanford University Press, 1964.

46. Hayes, CJ. H. *Nationalism : A Religion,* New York : McMillan, 1960.

47. Hechter, Michael, *Internal Colonialism : The Celtic British National Development.* London : Routledg and Kegan Paul, 1985.

48. Holsti, K.J., *Change in the Internatiional System : Interdependence, Integration and Fragmentation*, Colorado : Westview Press, 1980.

49. Horowitz, Donald L., *Ethnic Groups in Conflict*, Berkeley : University of California Press, 1985.

50. Hourani, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age*, 1798-1939, London : Oxforc University Press, 1970.

51. Iqbal, Sir Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam,* Lahore : S. M. Ashraf, 1944.

52. ... , *Bang-i-Dira*, Lahore, 1959.

53. ... , *Darb-i-Kalfm*, Lahore, 1959.

54. Isaacs, Harold, *Idols of the Tribe,* New York : Harper and Row, 1975.

55. Jansen, G. H., *Militant Islam*, London : Pan Books, 1979.

56. Kasfir, Nelson, "Explaining Ethnic Political Participation", *World Politics*, 31, no. 3 (April 1979), 365-388.

57. Keddie, Nikki R., *An Islamic Response to Imperialism : Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad Din "Afghani", Berkeley : University of California Press, 1983.*

58. Keohane, Robert and Nye, J. S., "International Interdependence and Integration" *Handbook of Political Science*, ed., F. I. Greenstein and N. W. Polsby, Reading Ma : Adison-Wesley, 1975.

59. ... , and Nye, J. S., Transational Relations", *International Organization* (Special Issue), 25, no. 3 (1971).

60. Khan, Muhammad Ayub, *Friends not Masters,* London : Oxford University Press, 1967.

61. Khomeini, Imam, *Islam and Revolution,* tr., Hamid Algar, Berkeley : Mizan Press, 1991.

62. Kohn, Hans, *The Idea of Nationalism*, New York : McMillan, 1948.

63. Krasner, S. D., ed., *International Regimes, International Organization,* 36. no. 2 (Spring 1982).

64. Kuhn, Thomas S., *The Structure of Scientific Revolution*, Chicago : University of Chicago Press, 1970.

65. Ladipus, Gail W., "Ethno-nationalism and Political Stability : The Soviet Case", *World Politics*, (July 1984).

66. Lenin, Vladimir, *Questions of National Policy and Proletarian Internationalists.* Moscow : Progress Publishers, 1953.

67. Low, Alfred D., *Lenin on the Question of Nationality,* New York : Bookman Associates, 1958.

68. Marx, Karl and Engels, Friedrick, *The Communist Manifesto,* New York : Penguin Books, 1967.

69. Maududi, Sayyid Abul A'la, *Political Theory of Islam*, Lahre : 1960.

70. ... , *Nationalism and India*, Pathankot : Maktaba-i-Jamaat-Islami, 1967.

71. Mujahid, Sharif al-, "Muslim Nationalism : Iqbal's Synthesis of Pan-Islamism and Nationalism", *American Journal of Islamic Social Sciences*, 2, no., 1 (July 1985).

72. *The Muslim World Book Review*, (Summer 1982).

73. Naipaul, V. S., Among the Belivers : An Islamic Journey, London : Andre Deutsch, 1981.

74. Nairn, Tom "The Modern Janus", *New Left Review* (November-December, 1985)

75. Wolf Ken, "Hasn Kohn's Liberal Nationalism", *Journal of the History of Ideas*, 4 (October-December, 1976).

৭৬. Young Crawford, "The Temple of Ethnicity", *World Politics*, (July 1983). □

বিআইআইটি'র বাংলা বইসমূহ

♦ আত-তাওহীদ : চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য	*ইসমাইল রাজী আল ফারুকী*	১৭৫/-
♦ ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ	*ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান*	৩০০/-
♦ ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	*ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান*	২৫০/-
♦ মুসলিম মানসে সংকট	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	১৫০/-
♦ জ্ঞানের ইসলামায়ন	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	৩০/-
♦ ইসলামের দন্ডবিধি	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	২০/-
♦ ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ	*ড. এম উমর চাপরা*	২০০/-
♦ ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন	*ড. এম উপর চাপরা*	২০০/-
♦ রাসূলের (স:) যুগে মদীনার সমাজ (১ম খণ্ড)	*ড. আকরাম জিয়া আল আমরী*	৫০/-
♦ রাসূলের (স:) যুগে মদীনার সমাজ (২য় খণ্ড)	*ড. আকরাম জিয়া আল আমরী*	১৭০/-
♦ রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা (২য় খণ্ড)	*আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ*	৩০০/-
♦ রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা (৪র্থ খণ্ড)	*আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ*	৩০০/-
♦ কোরআন ও সুন্নাহ: স্থান-কাল প্রেক্ষিত	*তাহা জাবির আল আলওয়ানী ও ইমাদ আল দীন খলিল*	৫০/-
♦ ইসলামে উসুলে ফিকাহ	*ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী*	৭০/-
♦ ইসলামী শিক্ষা সিরিজ (১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড একত্রে)	*ড. জামাল আল বাদাবী*	৩০০/-
♦ মুসলিম নারী-পুরুষের পোশাক	*ড. জামাল আল বাদাবি*	২০০/-
♦ রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ইসলামী প্রেক্ষিত	*অধ্যাপক আবদুর রশিদ মতিন*	১৭৫/-
♦ প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামী প্রেক্ষিত	*ড. মুহাম্মদ আল ব্যুরে*	৩০০/-
♦ শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ইসলামী প্রেক্ষিত	*ড. এম. জাফর ইকবাল*	১৫০/-
♦ উন্নয়ন ও ইসলাম	*প্রফেসর খুরশিদ আহমেদ*	৩৫/-
♦ তাফসীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক	*প্রফেসর ড. রশীদ আহমদ কালঙ্করী*	১০০/-
♦ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী	*বি.আইশা লেমু ও ফাতিমা হীরেন*	৫০/-
♦ ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ	*এম আকরাম খান, এম রকিবুজ জামান*	৭০/-
♦ লোক-প্রশাসন : সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা	*প্রফেসর আবদুন নূর*	২০০/-
♦ ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট	*প্রফেসর ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী*	২০০/-
♦ ইসলামী জীবনবীমা : বর্তমান প্রেক্ষিত	*কাজী মো: মোরতুজা আলী*	১৭৫/-
♦ ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা-সামাজিক প্রেক্ষাপট	*এম রুহুল আমিন অনুদিত*	১৩০/-
♦ আমাদের সংস্কৃতি	*প্রফেসর মো: জয়নুল আবেদীন মজুমদার সম্পাদিত*	৬০/-
♦ গণতন্ত্র ও ইসলাম	*এম. আবদুল আযিয সম্পাদিত*	১২০/-
♦ সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম	*এম. আবদুল আযিয সম্পাদিত*	১০০/-

লেখক পরিচিতি

ড. তাহির আমিন কায়েদে আযম ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ-এ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রফেসর। তিনি আমেরিকার MIT থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচডি করেছেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী-

Tashkent Declaration *(Islamabad, Institute of Srategic Studies,1980)*

Afghanistan Crisis : Implication and Options for Iran, Pakistan and the Muslim World *(Islamabad, Institute of Policy Studies 1982)*

Ethno-National Movments of Pakistan : Domestic and International Factors *(Islamabad, Institute of Policy Studies 1988)*

অনুবাদক পরিচিতি

ড. এম. মনিরুজ্জামান জাপানের নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন গবেষণার উপর পিএইচডি করেছেন। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

ISBN
984-70103-0006-0